শিক্ষা না সেবা।

জে. কৃষ্ণমূর্ত্তি

(Alcyone)

প্রণীত।

অনুবাদক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল।

৪ নং কলেজ স্কোয়ার

বঙ্গীয় থিওসোফিক্যাল সভা হইতে

হোয়াইট্ লোটাস্ পাব্লিশিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯১২।

প্রকাশক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু।

হোয়াইট্ লোটাস্ পাব্লিসিং কোং,

২নং কৈলাস দাসের লেন,—কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,

মেট্কাফ্ প্রেস্,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মুখবন্ধ।

শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট লিখিত।

দূর অতীত জন্মান্তরে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থের লেখক শিক্ষাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। মনে হয় যেন, তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শিক্ষাবিষয়ক আগ্রহ ইহজন্মে সঙ্গে আনিয়াছেন। কাশীতে অবস্থান কালে তিনি কাশীস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সতর্ক মনোযোগ দিতেন। অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সদ্ভাব লক্ষ্য করিতেন, যে সদ্ভাব দক্ষিণ ভারতের বিদ্যালয়সমূহে তাঁহার অপরিচিত ছিল। দেখা যায়, তিনি শিক্ষাসমস্যার বিষয়ে অনেক কথা ভাবিয়াছেন এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার জন্য আবশ্যক আদর্শ সকল আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষক যে আসন অধিকার করিতেন, তাঁহাকে আবার সেই আসনে বসাইতে হইবে, যেন শিক্ষকতা

সমাজে বিশেষ সম্মানের আস্পদ হয়। জগতের পালনকার্য্যে যে সকল মহাপুরুষ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইটী বিভাগ লক্ষিত হয়—শাসনবিভাগ ও শিক্ষাবিভাগ। প্রত্যেক শিক্ষক যেন নিজেকে ঐ শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং সদ্গুরু ও শিষ্যের যে সম্বন্ধ, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ যেন তাহারই অনুরূপ হয়। শিক্ষক ছাত্রকে রক্ষাকর ও কল্যাণপ্রদ স্নেহ দান করিবেন; প্রতিদানে ছাত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তি অর্পণ করিবে। ইহাই প্রাচীন হিন্দু আদর্শ। এই আদর্শ আমাদের নিকট অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে; কিন্তু যদি কোন দেশে এই আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবে তাহা ভারতীয় ছাত্রের জন্য ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারাই হইতে পারিবে। সেই জন্য গ্রন্থকারের মনের মধ্যে যেন একটী সংকল্প প্রচ্ছন্ন আছে, বোধ হয় যে, এরূপ একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে, যেখানে এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা যাইতে পারে। এই বিদ্যালয় একটী থিওসফিক্যাল স্কুল ও কলেজের আকার ধারণ করিবে; কারণ, থিওসফি দ্বারাই প্রাচীন হিন্দু আদর্শসকল সঞ্জীবিত হইতেছে

এবং থিওসফিই সেই প্রাচীন অমৃতরস রক্ষা করিবার জন্য যোগ্য পাত্র গঠন করিতে সমর্থ।

বিদ্যালয় হইতে তাড়নাকে বিতাড়িত করিতে হইবে। শুধু বেত্রাঘাত-রূপ পাশব আচার নহে, সর্ব্ববিধ পীড়না, যদ্দ্বারা বালকদিগকে আত্মমর্য্যাদা ও পৌরুষের পরিবর্ত্তে মিথ্যাচার শিক্ষা দেয়। শিক্ষক নিজে আদর্শের সজীব প্রতিমূর্ত্তি হইবেন, যেন ছাত্র বিস্ময় ও ভক্তির বশে সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে পারে। যাঁহারা জানেন, অনাবিল শিশু-হৃদয় কেমন সহজে উচ্চ আদর্শের প্রতিধ্বনি করে, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন যে, যে শিক্ষক মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা ছাত্রদিগকে প্রণোদিত করেন এবং ভয়ের বেত্রাঘাতে নহে, প্রেমের রাজদণ্ডে শাসিত করেন, সেরূপ শিক্ষকের প্রভাব কত শক্তিশালী হয়। গ্রন্থকার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এক মহা-চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই মহাচৈতন্যের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।

বালকদিগের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাপ্রণালীর

পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। একটী সরকারী অকাট্য প্রণালী প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং প্রাণপণে ছাত্রদিগকে তাহার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে হইবে, এরূপ করিলে চলিবে না। শিশুর স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তদনুসারে তাহার শিক্ষা নিয়মিত করিতে হইবে। এক কথায়, ছাত্রের মঙ্গলই একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ, যিনি সুশিক্ষক, শিক্ষারূপ সেবার জন্যই তাঁহার জীবন।

বিদ্যালয়কে একটী সদ্ভাব ও আনন্দের প্রস্রবণ করিতে হইবে, যেন ঐ কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকে ঐ সকল ভাব বিকীর্ণ হয়। কি পাঠ, কি ক্রীড়া—সমস্তকেই চরিত্রগঠনের সহায় করিতে হইবে। যেন ছাত্রকে মাতৃভক্ত স্বদেশসেবকে (good citizen এ) পরিণত করা যায়।

ভবিষ্যতের গর্ভে যে সকল সম্ভাবনা নিহিত আছে, ভাবী শিক্ষক এই বালক-গ্রন্থকার এইরূপে তাহার সংকল্প করিতেছেন। প্রার্থনা করি, যেন কিশোরের এই শুভ্র স্বপ্ন যৌবনের আর্য্যশক্তি বহন করে এবং যে মহাশক্তি পৃথিবীর মরুস্থলীকে ফুল্ল কুসুমের সুহাস্যে বিকসিত করিবেন, বালক যেন তাঁহার আধার হইতে পারে।

মহাগুরু

ও

তাঁহার সেবক মণ্ডলীর

উদ্দেশ্যে

উৎসৃষ্ট।

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমার প্রথম ছাত্রজীবনের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত। সাধন পথের শিক্ষাপ্রণালী হইতে আমি যে টুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে, সাধারণতঃ যেরূপ হয় তদপেক্ষা ছাত্র জীবনকে অনেক সুখকর করা যাইতে পারে। শিক্ষার ভাল পথ এবং মন্দ পথ উভয়েরই আমি ভুক্তভোগী; সেইজন্য যাহাতে ভাল পথে শিক্ষা চালিত হয়, তদ্‌বিষয়ে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অভিলাষী। এই শিক্ষার বিষয় আমার গুরুদেবের বড় প্রিয় বিষয়, সেইজন্য এই সম্বন্ধে আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমি যাহা কিছু লিখিতেছি তাহার অধিকাংশ আমি যাহা গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। আর গত দুই বৎসরে আমি কাশীস্থ সেণ্ট্রেল হিন্দু কলেজে মিঃ অ্যারণ্ডেল ও তাঁহার একনিষ্ঠ সহযোগী দলের কার্য্যপ্রণালী

লক্ষ্য করিয়াছি। সেখানে দেখিয়াছি যে শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে ছোট ভায়ের মত দেখেন এবং সতত তাহাদের সেবায় শক্তি ও সময়ের বিনিয়োগ করেন। অন্য পক্ষে আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা শিক্ষকদিগের প্রতি এমনই সম্মান ও সস্নেহ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, যাহা আমি পূর্ব্বে অসম্ভব মনে করিতাম।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, এই গ্রন্থে যে সকল আদর্শ উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণ শিক্ষকের তাহা ক্ষমতাতীত এবং প্রচলিত বিদ্যালয়ে তাহা করা অসম্ভব। উত্তরে বলি যে, অন্ততঃ একটী বিদ্যালয়ে অর্থাৎ কাশীর হিন্দু কলেজে আমার প্রস্তাবগুলি অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমার কোন কোন প্রস্তাব হয়ত এখনকার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করা অসম্ভব; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শিক্ষকেরা ঐ সকল প্রস্তাবকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং স্বীয় পদের প্রকৃত গৌরব উপলব্ধি করিবেন, তখনই সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে থাকিবে। আমার মনে হয় যে, ঐ সকল প্রস্তাবের অধিকাংশই সকল দেশবাসী এবং সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি

প্রযোজ্য ; তৎসমুদয় জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আমাদের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ে যদি বালক-দিগকে জীবের ঐক্য ও ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার বিষয় শিখাইতে পারা যায়, তবে আমাদের ভবিষ্যতের আশা কত না উজ্জ্বল হয়! ছাত্রদিগকে যদি এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে, পৃথিবীময় সকল ছাত্রই এক পরিবার ভুক্ত—অতএব স্বজাতিপ্রেমে অন্ধ হইয়া অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা কথনই সঙ্গত নহে ; তাহা হইলে জাতিগণের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ অচিরে তিরোহিত হইয়া বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বালকদিগের স্বদেশপ্রেম অতি সুন্দরভাব, সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা তাহারা নিঃস্বার্থতা ও উচ্চ আদর্শের জন্ম বল লাভ করে। কিন্তু এই স্বজাতি প্রেম যদি বিজাতি-বিদ্বেষ আনয়ন করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রেম নয়। আমি শুনিয়াছি যে, জগতে নানা স্থানে অনেক সভাসমিতি আছে, যাহাদের উদ্দেশ্য বালকদিগের মনে দেশভক্তি এবং স্বদেশের সেবার ইচ্ছা উদ্দীপিত করা। এ সকল অনুষ্ঠান সাধু, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি এরূপ

একটী আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান দেখিতে চাই, যাহার উদ্দেশ্য হইবে সর্ব্বজাতির বালকদিগকে সমান আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং যে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃভাব, সমস্ত শুভকর্ম্মের মূল ভিত্তি, সেই ভাবে বালকদিগকে সঞ্জীবিত করা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন কালে আমার মাতৃরূপা শ্রীমতী অ্যানি-বেশেণ্ট আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ জি এস্ আরণ্ডেল (G. S. Arandale) (যাঁহার সহিত আমি অনেক সময় এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি) আমাকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

জে. কৃষ্ণমূর্ত্তি

সূচীপত্র।

শিক্ষক

শিক্ষা না সেবা।

শিক্ষক ;

আমার গুরুদেব আমাকে জগতের সেবাব্রতে দীক্ষিত করিবার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি "শ্রীগুরুচরণে" নিবদ্ধ করিয়াছি। যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গুরুদেবের বাক্যগুলি কিরূপ অমোঘ; যিনিই উহা পাঠ করেন, তাঁহারই পরের সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হয়। আমি জানি, আমি নিজে আমার শিক্ষকদিগের সস্নেহ যত্নের দ্বারা কি পরিমাণ উপকৃত হইয়াছি; তাঁহাদের নিকট আমি যে উপকার লাভ করিয়াছি, অপরকে তাহার ভাগী করি, ইহাই আমার বাসনা।

আমার মনে হয় যে, গুরুদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি সকল ভূমিতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ঐ উপদেশ যে কেবল প্রকৃত দীক্ষা-কামী সাধনমার্গের পথিকের পক্ষেই উপযোগী—তাহা নহে;

যাঁহারা জগতের ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উহা উপযোগী। জগতে যত প্রকার কার্য্য আছে, তাহার মধ্যে শিক্ষকের কার্য্য অতি মহৎ কার্য্য; দেখা যাউক, ঐ কার্য্য সম্বন্ধে গুরুদেবের উপদেশগুলি কি ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে।

"শ্রীগুরুচরণে" যে সাধন-চতুষ্টয় উল্লিখিত হইয়াছে, শিক্ষক ও ছাত্রের জীবন সম্বন্ধে এবং তাহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে ঐ সাধন চতুষ্টয় কি ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শিক্ষাকার্য্যে সর্ব্বপ্রধান সাধন—প্রেম; অতএব প্রথমেই উহার আলোচনা করিব। ক্ষোভের বিষয়, ইদানীং শিক্ষকের কার্য্য অন্যান্য উচ্চ কার্য্যের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয় না। যাহাকে তাহাকে শিক্ষক হইবার উপযুক্ত মনে করা হয়। তাহার ফলে শিক্ষকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় না। সেইজন্য স্বভাবতঃ যাহারা শক্তিশালী ছাত্র, তাহারা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষকের কার্য্যের ন্যায় পবিত্র

এবং জাতির পক্ষে হিতকর কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই; কারণ, ঐ কার্য্যের দ্বারাই জাতির ভবিষ্যতের ভরসাস্থল বালকবালিকাদিগের চরিত্র গঠিত হয়। প্রাচীনকালে শিক্ষকের কার্য্য এরূপ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত যে, কেবল ধর্ম্মাচার্য্যেরাই শিক্ষকতা করিতেন, এবং বিদ্যালয় দেবালয়ের অংশ ছিল। ভারতবর্ষে শিক্ষকের প্রতি লোকের এরূপ আস্থা ছিল যে, পিতামাতারা বহু বৎসর ধরিয়া সন্তানদিগকে সম্পূর্ণরূপে গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া রাখিতেন এবং গুরু-শিষ্যে একপরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। এই সুখদ সম্বন্ধ আবার ফিরিয়া আসা উচিত। সেইজন্য শিক্ষক যে সকল সাধনবিশিষ্ট হইবেন, তাহার মধ্যে আমি প্রেমকে প্রথম স্থান দিতেছি। যদি ভারতবর্ষকে আবার এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয় (যাহা আমরা সকলেই আশা করি), তবে এ দেশে গুরু-শিষ্যের সেই প্রাচীন সম্বন্ধকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

১। প্রেম।

প্রেম।

আমার গুরুদেব আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যাহার প্রেম আছে, তাহার পক্ষে অন্য গুণ অর্জ্জন করা সম্ভব ; কিন্তু প্রেম না থাকিলে অন্য সমস্ত গুণও যথেষ্ট নহে। অতএব দৈনিক জীবনে যে ব্যক্তির প্রকৃতিতে প্রেমই প্রধান গুণ বলিয়া লক্ষিত না হইয়াছে, তাহার শিক্ষক হওয়া উচিত নয়—তাহাকে শিক্ষক হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, শিক্ষক হইবার উপযোগী প্রেমবৃত্তি কাহারও হৃদয়ে আছে কি না, ইহা কিরূপে ধরা যাইবে? উত্তরে বলি যে, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উপযোগী বিশেষত্ব অল্প বয়সেই বালকদিগের প্রকৃতিতে লক্ষ্য করা যায়। অতএব যে বালকের প্রকৃতি সবিশেষ প্রেমপ্রবণ লক্ষিত হইবে, বুঝিতে হইবে যে, সেই বালকই শিক্ষক হইবার উপযুক্ত এবং অন্যান্য বৃত্তি বা ব্যবসায়ের জন্য বালকগণকে যেরূপ প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ শিক্ষকবৃত্তির জন্য ঐ বালককে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এক বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র এক সঙ্গে বাস করে এবং ভিন্ন ভিন্ন

বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হয়। যদি তাহাদের ছাত্রজীবন সুখকর হয়, তবেই তাহারা বড় হইয়া দেশের উপকারে লাগিবে। শিশুরা স্বভাবতঃ আনন্দময় ; যদি গৃহে এবং বিদ্যালয়ে তাহাদের প্রকৃতি-গত আনন্দের ব্যাঘাত না হয়, তবেই তাহারা বড় হইয়া অপরকে সুখী করিতে পারিবে। যে শিক্ষকের হৃদয় ভালবাসা ও সহানু-ভূতিতে পূর্ণ, তিনি ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং তাহাদের ছাত্রজীবন সুখকর করেন। আমার গুরুদেব একদিন বলিয়া-ছিলেন,—'শিশুরা শিখিবার জন্য স্বভাবতঃ উৎসুক ; যে শিক্ষক তাহাদের পাঠে মনোযোগী করিতে এবং অনুরাগী করিতে না পারেন, তিনি শিক্ষক হইবার উপযুক্ত নন, তাঁহার অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত'। তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—'যাহারা আমার গণ, তাহারা শিক্ষা দিতে এবং সেবা করিতে ভালবাসে'। ক্ষুধার্ত্ত যেমন আহারের অন্বেষণ করে, তাহারা সেইরূপ সেবা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে এবং সর্ব্বদা তজ্জন্য অবহিত থাকে। তাহাদের হৃদয় ভগবৎপ্রেমে এমন পূর্ণ যে, সে প্রেম চতুর্দ্দিকে অহরহঃ প্রবাহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহারাই শিক্ষক

হইবার উপযুক্ত, শিক্ষাকার্য্য যাঁহাদের নিকট পবিত্র ও অবশ্য-করণীয় বলিয়া মনে হয় এবং শিক্ষাদানে যাঁহারা সবিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। যে শিক্ষক সহৃদয়, তিনি ছাত্রের মধ্যে যে কিছু সদ্‌গুণ আছে, তাহা নিষ্কাসন করেন; তাঁহার সৌম্য ভাব ছাত্র-দিগকে অভয় দান করে। তখন প্রত্যেক বালক তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে, এবং শিক্ষক ঠিক বুঝিতে পারেন, কোন্ ধারা তাহার ঠিক উপযোগী এবং তাহাকে সেই ধারায় চালিত করেন। এরূপ শিক্ষকের নিকট ছাত্রেরা নিজেদের সমস্ত বিপত্তি প্রকাশ করে; কারণ, তাহারা জানে যে, তিনি তাহাদের সহিত সহৃদয় এবং সদয় ব্যবহার করিবেন। সেইজন্য তাহারা নিজেদের দোষ গোপন না করিয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে সমস্ত কথা বলে; কারণ, তাহারা নিশ্চয় জানে যে, তাঁহার সস্নেহ সাহায্য হইতে কখনই বঞ্চিত হইবে না। যিনি ভাল শিক্ষক, তিনি নিজের বাল্যকালের কথা মনে রাখেন এবং যে বালক তাঁহার সাহায্য চায়, তাহার সহিত সহানুভূতি করিতে পারেন। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন যে,—'যে নিজের শৈশবের কথা ভুলিয়াছে এবং শিশুদের প্রতি

সহানুভূতি হারাইয়াছে, সে কখনও শিশুদের শিক্ষা দিতে কিংবা সাহায্য করিতে পারে না'।

ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই যে ভালবাসা—যাহা তাহাকে ত্রাণ করে এবং সাহায্য করে—তাহার বিনিময়ে ছাত্রও শিক্ষককে ভালবাসিতে থাকে এবং এই ভালবাসা ঊর্দ্ধগামী হইয়া সম্ভ্রমের আকার ধারণ করে। এইরূপে ছাত্রের হৃদয়ে যে সম্ভ্রমের ভাব জাগরূক হয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তাহা মহিমা-জ্ঞান ও মহত্ত্ব-পূজার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং কালে তাহাকে সদ্‌গুরুর চরণপ্রান্তে উপনীত করে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের এই ভালবাসা তাহাকে শান্ত ও বিনীত করে এবং তাহার ফলে তাড়নার কথাই কখন উঠে না। এইরূপে একটা মহৎ ভয়ের কারণ—যাহা এখন শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ বিষদিগ্ধ করিতেছে তাহা চলিয়া যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সদ্‌গুরুর শিষ্য হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাঁহারা জানেন যে, সে সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত। দোষ করিলেও এবং দুর্ব্বলতা দেখাইলেও, তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, মধুরতা এবং সহানুভূতি

প্রকাশ করেন, তাহা আমরা জানি। অথচ সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে ব্যবধান, তাঁহাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যবধান।

সিদ্ধ মহাপুরুষেরা যেমন আপনাদিগকে জীবসেবার জন্য নিবেদন করিয়াছেন, সেইরূপ শিক্ষক যখন আপনাকে দেশের সেবায় নিবেদিত মনে করিবেন, তখনই তিনি জগতের মহাশিক্ষা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবেন—দেবতা ও মানবের শিক্ষাদাতা জগদ্‌গুরু যে শিক্ষাবিভাগের প্রধান আচার্য্য।

আপত্তি হইতে পারে যে, অনেক ছাত্রকেই এ ভাবে শিক্ষা দেওয়া চলে না; তদুত্তরে বলি যে, কুশিক্ষা দ্বারা সে সকল বালককে পূর্ব্বেই নষ্ট করা হইয়াছে। তাহা হইলেও, তাহাদিগকে সমুচিত ধৈর্য্য এবং সর্ব্বক্ষণ ভালবাসা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত করিতে হইবে। এই ভাবে চেষ্টা করিয়া অনেক স্থলে সফলতা লাভ হইয়াছে।

ছাত্র বিদ্যালয়ের কয়েক ঘণ্টা যদি এই প্রেমের বায়ু সেবন করিতে পায়, তবে সে গৃহে ফিরিয়া সুপুত্র ও সুভ্রাতা হইতে পারিবে

এবং এখন যেমন সে পরিশ্রান্ত ও অবসন্নভাবে গৃহে ফিরে, সেরূপ না করিয়া সে জীবন্ত উৎসাহের ভাব সঙ্গে আনিবে। কালে যখন সে গৃহস্বামী হইবে, তখন সে নিজে যে প্রেমে পরিপুষ্ট হইয়াছে, সেই প্রেমে গৃহাঙ্গন পূর্ণ রাখিবে। এইরূপে বংশপরম্পরায় ঐ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইবে। ঐরূপ ছাত্র যখন পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইবে, তখন সে নিজের পুত্রকে কেবল স্বার্থের চক্ষে দেখিবে না। এখন যেমন অনেক পিতা ভাবেন—যেন পুত্র তাঁহার সম্পত্তি, যেন সে তাঁহার জন্যই আছে। এখন অনেক পিতা পুত্রদিগকে নিজ পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ মনে করেন এবং তদনুসারে তাহাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ঐ সকল কার্য্যে তাঁহারা পুত্রদিগের ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি পাত করেন না। যিনি বুদ্ধিমান্ পিতা, তিনি পুত্রের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করেন। কোন্ বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন, এবং পুত্রের সেই ইচ্ছা যাহাতে সুপথে চালিত হয়, তৎপক্ষে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাকে সাহায্য করেন। সু-পিতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, তাঁহার পুত্র

একটী জীব, যে তাঁহার অতিথি হইয়াছে, যেন তিনি তাহার উন্নতির সহায়তা করিয়া নিজে সুকর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারেন। সু-পিতা ইহাও বিস্মৃত হন না যে, যদিও তাঁহার পুত্রের শরীর শিশু বটে, কিন্তু তাহার আত্মা শিশু নহে, হয়ত তাঁহারই মত বর্ষীয়ান্। অতএব পুত্রের সঙ্গে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার ব্যবহার করাই উচিত।

এইরূপে উভয় গৃহ ও বিদ্যালয়ে পরিপুষ্ট প্রেমভাব সর্ব্বক্ষণ ছোট ছোট সেবাকার্য্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহা হইতে ছাত্রের এমন একটী অভ্যাস জন্মে যে, কালে তদ্দ্বারা দেশের মহিমা-বর্দ্ধক কোন মহত্তর এবং বৃহত্তর সেবাকার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

গুরুদেব নিষ্ঠুরতাকে প্রেমবিরোধী পাপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার ভেদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ইচ্ছা করিয়া অপর প্রাণীকে কষ্ট দেওয়ার নাম ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা। ইহা অতি পাপকার্য্য। মানুষ নহে, পিশাচেই এরূপ করে'। ছাত্রের উপর বেত্রাঘাত এই পাপের অন্তর্গত; কারণ, গুরুদেব ইচ্ছাকৃত পাপের কথায় বলিয়াছেন যে,—'অনেক

শিক্ষক সর্ব্বদাই এই পাপের অনুষ্ঠান করে'। যে বাক্য বা কার্য্য দ্বারা শিক্ষক ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাত্রের মনে ব্যথা দেন বা তাহার আত্ম-সম্মানে আঘাত করেন, তাহাও এই পাপের অন্তর্গত। কোন কোন দেশে শারীরিক তাড়না নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ দেশে ইহা এখনও প্রচলিত। আমার গুরুদেব এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'এই সমস্ত লোককে এই পাশবিক নির্দ্দয়তার কথা বলিলে, তাহারা বলে যে, ইহাই রীতি—চিরকালই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেক লোকে অনেক দিন ধরিয়া একটা কোন পাপকার্য্য করিয়া আসিতেছে বলিয়া, তাহা যে পাপ নহে এরূপ নয়। 'কর্ম্ম' রীতির মুখাপেক্ষী নহে—আর এই নির্দ্দয়তার কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। ভারতবর্ষে এ প্রকারের নির্দ্দয় রীতি একেবারে অমার্জ্জনীয়। কারণ অহিংসা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা ভারতবর্ষে সকলেই অবগত আছে'।

তাড়নার যাহা মূল কথা, তাহা কেবল যে ভ্রমাত্মক, তাহা নহে—তাহা মূর্খতা-মূলক। যে শিক্ষক ছাত্রদের ভয় দেখাইয়া অনুজ্ঞা পালন করান, তিনি দেখেন না যে, তাঁহার সাক্ষাতে মাত্র ছাত্রেরা

তাঁহার বাধ্য হয়, কিন্তু যেমন তাহারা তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হয়, অমনি তাহারা নিয়মের প্রতি অমনোযোগ করে এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগের অভাববশতঃ তাঁহার সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, আহ্লাদ বোধ করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ছাত্রেরা শিক্ষককে ভক্তি করে, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে ভালবাসে, এবং তজ্জন্যই তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও তাহারা তাঁহার নিয়ম পালন করিয়া চলে। এইরূপে তাঁহার কার্য্য অনেক সহজ হয়। যিনি সু-শিক্ষক, তিনি ছাত্রদের প্রকৃতিতে ভয় ও বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, তাহাদের চিত্তে প্রেম ও ভক্তির উদ্রেক করিয়া আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করেন। এইরূপে তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাই সবল হয় এবং তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

দুষ্ট বালককে ভাল করিবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে। কখন কখন সহপাঠিগণের কল্যাণের জন্য কোন বালককে স্বতন্ত্র করিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু তখনও সেই বালকের মঙ্গলের প্রতিই যেন লক্ষ্য রাখা

হয়। বস্তুতঃ সমস্ত ছাত্রজীবনে ছাত্রের মঙ্গলকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে। শিক্ষকের কিসে পরিশ্রমের লাঘব হয়, ইহা কখনই লক্ষ্যের বিষয় নহে; কারণ সু-শিক্ষক কষ্ট স্বীকার করিতে অসম্মত নহেন।

অনেক সময় অনবধান হইতে অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার উৎপত্তি হয়। শিক্ষক যেন অনবধানতা বশতঃ কোন নিষ্ঠুর বাক্য বা নিষ্ঠুর কার্য্য না করেন। অনেক সময় শিক্ষক হয়ত অন্য কোন কারণে বিরক্ত আছেন অথবা কোন আবশ্যক কর্ত্তব্যে ব্যস্ত আছেন। ঐ অবস্থায় ছাত্রের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দুর্ঘট নহে। শিক্ষক হয়ত ঐ ঘটনা ভুলিয়া যান অথবা অকিঞ্চিৎ মনে করেন, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহার বাক্য দ্বারা সুকুমার বালকের হৃদয়ে আঘাত লাগে। সে ঐ রূঢ় বাক্য লইয়া মনে মনে অনেক আন্দোলন করে এবং বালকস্বভাবে শিক্ষকের সম্বন্ধে কত কি মন্দ ভাবে। এইরূপে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হয়। অবশ্য ছাত্রের পক্ষে ধীর ও সহৃদয় হওয়াই উচিত। তাহার মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষক যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

কিন্তু শিক্ষকও যেন সর্ব্বদা তাঁহার বাক্যের সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন এবং যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, যেন সর্ব্বদা তাঁহার বাক্য ও ব্যবহার শান্ত ও সংযত হয়।

ছাত্রেরা তাঁহার কনিষ্ঠ, তিনি তাহাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ—এই ভাবিয়া, যে শিক্ষক সর্ব্বদা ছাত্রদিগের সম্বন্ধে মৃদু ব্যবহার করেন, তিনি সহজেই তাঁহার ছাত্রদিগকে শিশুদিগের প্রতি এবং পশুপক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দিতে পারেন। জ্যেষ্ঠ বালকদের মধ্যে যাহারা শান্ত এবং সুবোধ, লোকে রাজপথে পশুদের প্রতি কিরূপ আচরণ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া ভাল। যদি তাহারা পশুর প্রতি কাহারও কোন নির্দ্দয় আচরণ দেখে, তবে যেন সেই অত্যাচারী ব্যক্তিকে ধীরভাবে ও ভদ্রভাবে নিবারণ করে। ছাত্রদের ইহাও শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, যাহাতে জন্তুদের হত্যা করা হয়, এরূপ কোন কার্য্য 'স্পোর্ট্' (ক্রীড়া) নামের যোগ্য নহে। বীরোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়াই 'স্পোর্ট্' নামের যোগ্য। প্রাণীদিগের দেহে আঘাত করা ও হত্যা করা 'স্পোর্ট্' নহে। গুরুদেব বলিয়াছেন,—'যাহারা স্পোর্টের

নামে ভগবানের জীবকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে, নিষ্ঠুরতার বিষম ফল তাহাদিগের ফলিবেই।'

পরনিন্দা—যাহাকে আমার গুরুদেব প্রেমবিরোধী পাপ বলিয়াছেন—তদ্দ্বারা অপরের কত অনিষ্ট ও যাতনা ঘটান হয়, বোধ হয় অনেক শিক্ষকের তাহা ধারণায় নাই। ছাত্রদের সম্বন্ধে অসাক্ষাতে নিন্দা করিয়া, যাহাতে তাহাদের ছাত্রজীবন কঠিনতর করা না হয়, শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। বিদ্যালয়ে কখন কোন ছাত্রের দুর্নাম রটিতে দেওয়া উচিত নহে, এবং এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে, কি শিক্ষক, কি ছাত্র, বিদ্যালয়ের কোন লোক অপরের নিন্দা করিতে পারিবে না।

আমার গুরুদেব দেখাইয়াছেন যে, পরনিন্দার দ্বারা আমরা নিন্দিত ব্যক্তির যে সমস্ত দোষ আছে, তাহাকে সবল করি এবং নিজেদের মন অসৎচিন্তায় পূর্ণ করি। আমাদের অসৎ প্রকৃতি বর্জ্জন করিবার একটি মাত্র উপায় আছে; সে উপায়—সৎ প্রকৃতির পোষণ করা। অবশ্য শিক্ষকের কর্ত্তব্য বটে যে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ ছাত্রদিগের দোষ-দুর্ব্বলতার বিষয়ে অবহিত হইবেন।

কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে, কোন ছাত্রের অসৎ প্রকৃতি দূর করিবার একমাত্র উপায়—সেই বালককে ভালবাসার আবরণে আবৃত করা। এইরূপে তাহার উচ্চ ও মহৎ গুণগুলি জাগ্রত হইবে এবং শেষ-পরে তাহার চরিত্রে দুর্ব্বলতার অবকাশই থাকিবে না। শিক্ষক যতই ছাত্রদিগের দোষ সম্বন্ধে গ্লানি করিবেন, ততই বেশী অনিষ্ট করা হইবে। শিক্ষকেরা যখন পরস্পর ছাত্র-দিগের ব্যক্তিগত দোষ ক্ষালনের কিরূপে সহায়তা করিতে পারা যায়, তদ্‌বিষয়ে পরামর্শ করিবেন, সেই সময় ভিন্ন কোন শিক্ষক কখনও কোন ছাত্রের দোষের আলোচনা করিবেন না।

ছাত্রদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন তাহারা পরস্পরের মধ্যে পরনিন্দারূপ নিষ্ঠুর কার্য্য না করে। আমি জানি, অনেক বালকের ছাত্রজীবন তাহার সহপাঠীদিগের অনবধান ও নির্দ্দয় ব্যবহারে দুঃখময় হইয়াছে। শিক্ষক হয়ত তাহার এ দুঃখ লক্ষ্য করেন নাই, কিংবা তাহার সঙ্গীরা তাহার কি প্রকার অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। বালকেরা অনেক সময় ছাত্রবিশেষের কথার বা পরিচ্ছদের বিশেষত্ব, কিংবা সে হয়ত কোন ভুল করি-

আছে—সেই ভুল ধরিয়া বসে এবং তাহারা তাহাকে কি কষ্ট দিতেছে, তাহা মনে না করিয়া তাহাদের হতভাগ্য সঙ্গীকে নির্দ্দয় বচনে পীড়িত করে। এস্থলে তাহাদের কৃত অনিষ্ট অজ্ঞানকৃত। শিক্ষক মহাশয়ের যদি ছাত্রদিগের উপর প্রভাব থাকে, এবং তাহারা কি যাতনা দিতেছে, যদি তিনি ধীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তবে তাহারা শীঘ্রই ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হয়।

ছাত্রদিগকে ইহাও শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, যদ্দ্বারা অপরের পীড়া বা বিরক্তি হয়, তাহা কখন ঠিক কাজ হইতে পারে না এবং কোন সুবোধ বালকের তাহাতে আমোদ বোধ করা উচিত নহে। কোন কোন বালক অপরকে পীড়িত করিয়া কিংবা বিরক্ত করিয়া আমোদ অনুভব করে; ইহা তাহাদের অজ্ঞানতার ফল। একবার বুঝিতে পারিলে, তাহারা আর সেরূপ সৌভ্রাত্রের বিরোধী কার্য্য করে না।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক গৃহে আমার গুরুদেবের এই কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। "কাহারও গ্লানি করিও

না; কেহ অপরের গ্লানি করিলে, তাহাতে কান দিও না, বরং তাহাকে শান্তভাবে বলিও, হয়ত ইহা সত্য নহে; আর যদিই বা সত্য হয়, এ সম্বন্ধে আলোচনা না করাই করুণার কার্য্য"।

প্রেম-বিরোধী আর কয়েকটী পাপ আঁছে, যাহা সাধারণতঃ পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহা খুব প্রচলিত। শিক্ষক সতর্ক ভাবে এই পাপের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এবং যতদূর সম্ভব, ছাত্রদিগকে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন এবং অন্ততঃ নিজে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। আমার গুরুদেব কুসংস্কার-জনিত নিষ্ঠুরতার মধ্যে এইরূপ তিনটি পাপের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) জীববলি। সভ্যজাতিদিগের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এখানেও ইহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। পিতা মাতা এবং শিক্ষকদিগের উচিত বালকদিগকে বলা যে, যে প্রথা নিষ্ঠুর, তাহা কথনই সত্যধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। আমরা জানি যে, ধর্ম্ম একত্বই

শিক্ষা দেয় এবং প্রাণিমাত্রেরই প্রতি সদয় ও মৃদু ব্যবহার করিতে বলে। নির্দ্দয়তা এবং নিরীহ জীববলির দ্বারা ভগবান্ কখনই প্রীত হন না। বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রেরা যদি এই শিক্ষা লাভ করে, তবে যখন তাহারা বড় হইবে, তখন এই নিষ্ঠুর কুসংস্কারের একবারে বিলোপ সাধন করিতে পারিবে।

(২) আমার গুরুদেব বলিয়াছেন যে, আর একটি নিষ্ঠুরতর কুসংস্কার মানুষের মধ্যে খুব প্রচলিত আছে। সেটি এই যে, মাংস ভক্ষণ ভিন্ন মানুষের দেহরক্ষা হয় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের অপেক্ষা পিতামাতার অধিকার বেশী। কিন্তু শিক্ষকও ছাত্র-দিগকে ক্রমশঃ বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, খাদ্যের জন্য প্রাণিবধ কিরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য। যদি এরূপ করা যায়, তবে যদিও বালককে বাধ্য হইয়া বাড়ীতে মাংস খাইতে হয়, তথাপি যখন সে বড় হইবে, তখন সে মাংসাহার পরিত্যাগ করিবে এবং সে নিজের সন্তানদের নিরামিষাশী হইবার সুযোগ দিবে—যে সুযোগ হইতে সে নিজে বঞ্চিত ছিল। যদি বাড়ীতে পিতামাতারা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা কিশোর-বয়স্ক বালকদিগকে শিক্ষা দেন যে, সমস্ত

প্রাণীকেই ভালবাসা এবং রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, তবে ভবিষ্যতে জগৎ কি সুখের স্থান হইবে!

(৩) আমার গুরুদেব বলিয়াছেন যে, "কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, লোকে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণীর যে দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা ভ্রাতৃভাবকে কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও কুসংস্কার কিরূপ নির্ম্মল নিষ্ঠুরতা উৎপাদন করিতে পারে!" এই জাতীয় নিষ্ঠুরতা দূর করিতে হইলে, প্রত্যেক বালককে প্রেম-ধর্ম্মের মহিমা শিখাইতে হইবে। বিদ্যালয়ে এবং বাড়ীতে চেষ্টা করিলে এ বিষয় অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে। বিদ্যালয়ে এই পাঠ শিক্ষা করিবার ছাত্রদিগের অনেক সুযোগ আছে। বিদ্যালয়ের মধ্যে ভৃত্যাদির প্রতি এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে যে সকল দীন দুঃখীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাদের প্রতি ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করি-বেন যে, সমস্ত লোকই এক মহাপরিবারভুক্ত ; তবে কেহ অগ্রজ,

কেহ বা অন্ত্যজ। ভৃত্যদিগের প্রতি এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের প্রতি বালকদিগকে ভদ্রতা ও ভব্যতা শিখাইতে হইবে। অভিমান ও অভদ্রতা বাড়াইবার জন্য জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবান্ মনু শিখাইয়াছেন যে, দাসদিগের প্রতিও সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও শিক্ষকের অনেক কর্ত্তব্য আছে। যে শিক্ষক বালকদিগের খেলায় যোগদান করেন না, তিনি কখনও তাহাদের প্রিয় হইতে পারেন না। ভারতীয় বালকেরা ব্যায়াম-ক্রীড়ায় যথেষ্ট সময় দেয় না। বিদ্যালয়ের কতক সময় এ বিষয়ে ক্ষেপণ করা উচিত। যে সকল শিক্ষক যুবাকালে ব্যায়াম-ক্রীড়াশিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদেরও ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, বালকদিগের ক্রীড়ায় উৎসাহ দেখান উচিত। ছাত্রের শিক্ষার এ অংশেও তাঁহারা এইরূপে ভাগী হইতে পারেন।

যে সকল বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস আছে, সে স্থলে শিক্ষকের স্নেহময় হওয়া বিশেষ আবশ্যক ; কারণ, ছাত্রাবাস গৃহের স্থান অধিকার করে। অতএব তাহার মধ্যে গার্হস্থ্যভাব বিকসিত

হওয়া উচিত। প্রফুল্ল ও স্নেহময় শিক্ষকদিগকে ছাত্রেরা বড় ভাই-এর মত দেখে এবং নিয়মের দ্বারা যে সকল বাধার নিবারণ হয় না, প্রেমের দ্বারা তাহা সহজে দূর করা যায়।

ফলতঃ ছাত্রজীবনের বিবিধ চেষ্টাকে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রেম-সঞ্চারের ধমনীতে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপ ধমনী যত বেশী থাকিবে, ততই উভয় পক্ষের মঙ্গল। ছাত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বভাবতই এই সকল ধমনীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে এবং বিদ্যালয়ের স্নেহ-ভাব যুবাকালের বন্ধুত্বে পরিণত হইবে। এইরূপে প্রেমের জয় হইবে।

স্থূল জগতে প্রেমের নানা মূর্ত্তি—পতি-পত্নীর প্রেম, পিতা পুত্রের প্রেম, ভ্রাতাভগ্নীর প্রেম, আত্মীয়বন্ধুর প্রেম। কিন্তু শিষ্যের প্রতি গুরুর যে প্রেম, উহাতে ঐ সমস্ত প্রেম পুঞ্জীভূত ও সংবর্দ্ধিত হয়। গুরু শিষ্যকে মাতার স্নেহময় রক্ষণ, পিতার উদগ্র বল, ভ্রাতাভগ্নীর সহৃদয়তা এবং আত্মীয়বন্ধুর উৎসাহ দান করেন। তিনি শিষ্যের সহিত একাত্মা, শিষ্য তাঁহার অংশকলা। আরও গুরু শিষ্যের ভূতভবিষ্যৎ জানেন এবং শিষ্যকে অতীত

হইতে বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেন। শিষ্য কেবল বর্ত্তমান টুকু জানে। গুরুর যে প্রেম অতীতের স্মৃতিদ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ভবিষ্যতের সামর্থ্যগঠনে নিয়োজিত, শিষ্য তাহার কিছুই জানে না। গুরুর প্রেম শিষ্যের দৃষ্টির অতীত এক অদৃষ্ট উদ্দেশের অনুসারে কার্য্য করে। সেই জন্য শিষ্য সময়ে সময়ে তাহার দূর-দৃষ্টির সম্বন্ধে সন্দিহান হয়।

শিক্ষক-ছাত্রের যে সম্বন্ধের কথা বলিলাম, তাহাকে হয়ত খুব উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধগুরুর ও তাঁহার শিষ্যের মধ্যে যে অন্তর, সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক কম অন্তর। গুরু-শিষ্যের উচ্চ সম্বন্ধের অনুকরণে শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অন্ততঃ শিক্ষক যেন ঐ উচ্চ সম্বন্ধকে তাঁহার আদর্শ করেন। তাহা হইলে, শিক্ষার কার্য্য উচ্চ ভূমিতে উন্নীত হইবে এবং শিক্ষক ঐ আদর্শে চালিত হইলে, বিদ্যালয়ের সমস্ত জীবন সুখতর এবং শ্রেয়স্কর হইবে।

২। বিবেক।

বিবেক।

শিক্ষকের আর একটী অতি প্রয়োজনীয় সাধন এই বিবেক। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, যে "মানুষের সম্বন্ধে ভগবানের অভিপ্রায় কি, তাহারই জ্ঞান পরম জ্ঞান। কারণ, পরমেশ্বরের একটী অভিপ্রায় আছে। সে অভিপ্রায় জীবের অভিব্যক্তি।" অভিব্যক্তির সোপানে প্রত্যেক বালক আপন স্তর অধিকার করিয়া আছে। সে স্তর কোথায়, শিক্ষককে তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং সেই অবস্থায় তিনি কিরূপে ছাত্রের উন্নতির সহায়তা করিতে পারেন, তাহার আবিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুরা ইহাকে স্বধর্ম্ম বলেন। বালকের স্বধর্ম্ম কি শিক্ষককে তাহা জানিতে হইবে এবং তাহাকে সেই স্বধর্ম্ম পালনের সহায়তা করিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্রকে সেই শিক্ষাই দিবেন, যাহা তাহার বিকাশের অনুকূল এবং সেই শিক্ষার প্রকার সম্বন্ধে এবং প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষক বিবেক প্রয়োগ করিবেন। এই ভাবে শিক্ষিত হইলে,

ছাত্রের খুব দ্রুত উন্নতি হইবে। কারণ, সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রবণতার অনুরূপে পরিচালিত হইবে এবং তাহার প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইবে। একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, বিবর্ত্তনের প্রণালী এই যে, জীব সামঞ্জস্যের নিয়ম অনুসারে পুনঃ পুনঃ জড়-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এই সামঞ্জস্য-বিধির অন্য নাম জন্মান্তর ও কর্ম্ম। শিক্ষক যদি এই সত্যের সহিত পরিচিত না থাকেন, তবে তিনি বিবর্ত্তনের অনুকূলে চলিতে পারিবেন না এবং ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই সময়ের অনেকটা অপব্যয় হইবে। অনেক বৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াও ছাত্রদিগের মধ্যে যে এত অল্প ফল দৃষ্ট হয়, এই অজ্ঞতাই তাহার জন্য দায়ী। ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন চালিত করিবার জন্য এই দুই মহাসত্যের জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়; অথচ অনেক বালক এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

কি কি বিষয় ছাত্রকে শিখাইতে হইবে এবং কি প্রণালীতে শিখাইতে হইবে, সে বিষয়েও বিবেক চাই। সকলের অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা। ধর্ম্ম ও নীতি কেবল

পাঠ্যরূপে পড়াইলে, যথেষ্ট হইবে না ; কিন্তু ইহাদিগকে ছাত্র-জীবনের ভিত্তি ও চূড়া করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনে যে ছাত্র যে বৃত্তিই অবলম্বন করুক না কেন, ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। ধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা এক পরমাত্মারই অংশকলা। অতএব সকলের সকলকে সাহায্য করা উচিত। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন যে, "লোকরা নিজেদের প্রীতির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে। তাহারা বুঝেনা যে সকলেই এক, এবং সেই একমেবাদ্বিতীয়ের যাহা ইচ্ছা, তাহা ভিন্ন কোন কিছুতে কাহারও প্রকৃত সুখ হইতে পারে না।" গুরুদেব আরও বলিয়াছেন যে, "তোমার ও অপরের মধ্যে যাহা সমান, তদ্দ্বারাই তোমার ভ্রাতাকে তুমি সাহায্য করিতে পার। সেই সাধারণ বস্তু ভগবৎ-সত্তা"। এই শিক্ষাই ধর্ম্ম-শিক্ষা। এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করাই ধর্ম্মজীবন।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষায় সেরূপ সুফল হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা হয় না। বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এরূপ কোন উপাসনা হওয়া উচিত,

যাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ে এক সত্তা ও একতার তাণ ধ্বনিত হইয়া উঠে। এরূপ হইলে, গৃহস্থালীর ও জীবনপ্রণালীর ভেদ সত্বেও ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে একতার ভাবে ভাবিত হইবে। প্রথমেই কিছুক্ষণ কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্র-সংগীত হওয়া ভাল। এরূপ করিলে, ছাত্রগণ, যাহারা দ্রুত ভোজনের পর, ত্বরাত্বরি বিদ্যালয়ে আসিয়াছে, বিশ্রান্ত হইবার পর ধীরভাবে তাহারা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতে পাবে। ইহার পরই উপাসনা হওয়া উচিত এবং একটী সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা বালকদের সমক্ষে কোন উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই আদর্শকে ফলবান্ করিতে হইলে, সমস্ত দিনভোর তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যেন ঐ ধর্ম্মশিক্ষার ভাব, কি পাঠ, কি ক্রীড়া, সমস্তের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়ঃ—ধর্ম্মশিক্ষার ঘণ্টায় কোন দিন সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পরিত্রাণ ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইল। অথচ বাকী কয় ঘণ্টা সবলদিগকে দুর্ব্বলের অগ্রগামী হইতে উৎসাহিত করা হইল এবং ঐরূপ কার্য্যে সফলতার জন্য তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইল। এই পুরস্কার

বিতরণ দ্বারা অনেক বালকের ঈর্ষা উৎপাদন করা হয় এবং অনেককে নিরুৎসাহ করা হয়। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা বিরোধের ভাবকেই সমর্থন করা হয়।

কাশীর হিন্দুকলেজ-সংক্রান্ত যে ভ্রাতৃসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐ সভার মূলমন্ত্র এই :—'প্রেম ও সেবা করিবার উপচিত শক্তিই আদর্শ পুরস্কার'। যে সকল বালক সৎস্বভাব ও সৎকর্ম্মী এবং অপরের সাহায্যে পটু, যদি তাহাদিগের প্রতি উচ্চতর বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়, তবেই এই উৎকৃষ্ট মূলমন্ত্রটী কার্য্যে পরিণত হইবে। বাস্তবিক বিদ্যালয়ে, যাহারা চরিত্রবান্ ও সাহায্য-পটু, বুদ্ধিমান্ ও বলবানের অপেক্ষা তাহাদিগকেই সম্মান দেওয়া উচিত। অবশ্য চিত্তবল ও দেহবলের অনুশীলন ও পরিপোষণ করিতে হইবে ; কিন্তু সবল দুর্ব্বলের অগ্রগামী হইল বলিয়া, তাহাকে পুরস্কৃত করা উচিত নহে। বিদ্যালয়ে যদি এই ভাবে ছাত্রজীবন যাপিত হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল ছাত্র যখন বড় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন তাহারা কেবল নিজের অর্থ ও সামর্থ্য লাভের প্রতি

দৃষ্টি করিবে না, তাহারা এমন অধিকার খুঁজিবে যাহাতে দেশের হিতসাধন হয়।

নীতি শিক্ষার প্রধান অংশ বালককে দেশভক্ত করা—দেশব্রত শিক্ষা দেওয়া। বালককে যদি বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র পরিবারের সেবা-পর হইতে শিক্ষা দেওঁয়া হয়, তবে স্বভাবতই সে বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতিরূপ বৃহৎ পরিবারের সেবায় রত হইবে। এই ভাবে শিক্ষা পাইলে বালক -নিজের বৃত্তি-নির্ব্বাচনের সময় নিজেকে জাতিরূপ পরিবারভুক্ত বিবেচনা করিয়া, জাতীয় জীবনের হিতকর অধিকার বাছিয়া লইবে। কিন্তু দেশ-ভক্তি শিখাইবার কালে, বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন বালকেরা অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা না করে। অনেক স্থলে এইরূপই ঘটে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে আমাদের অধিক সতর্ক হইতে হইবে, যাহাতে ভারতীয় এবং বিদেশীয় শিক্ষকগণ ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন,—যেন উভয় জাতি মিলিত হইয়া, একই সাম্রাজ্যের কার্য্যে যোগ দিতে পারে।

পাঠ নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও বিবেক প্রয়োগ করিতে হইবে। যে

সকল পাঠ কঠিন, যথাসম্ভব দিবসের প্রথম ভাগে তাহা গৃহীত হওয়া উচিত; কারণ শিক্ষাকার্য্য যতই উত্তম ও সুশৃঙ্খল করা যাক না কেন, বিদ্যালয়ের শেষ কয়েক ঘণ্টায় বালকেরা পরিশ্রান্ত হইবেই হইবে।

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এবং মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার কোন্ বিষয়ে কত সময় প্রযুক্ত হইবে, সে সম্বন্ধেও বিবেক প্রয়োগ করিতে হইবে। শরীর-রক্ষা ও শারীরিক বিকাশ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে বালক সুস্থ নহে, তাহাকে শিক্ষাদান প্রায়ই নিষ্ফল হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছা থাকিলে, বালক সারাজীবন শিক্ষা করিতে পারে; কিন্তু কৈশোরই সুস্থ শরীর নির্ম্মাণের সময়; এই জন্য কিশোর বয়সে শরীরের স্বাস্থ্য ও বিকাশই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং শরীর সুস্থ রাখিয়া যাহা শিক্ষা করিতে পারা না যায়, সে শিক্ষা স্থগিত রাঁখা উচিত।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অধিকক্ষণ ও অধিক পরিমাণ পাঠ চাপাইয়া বালকদিগের, বিশেষতঃ শিশুদিগের মনকে পীড়া দেওয়া হয়। পাঠের মধ্যে মধ্যে অবকাশ দেওয়া উচিত এবং শিক্ষকের

সতর্ক থাকা উচিত, যেন ছাত্রের মন শ্রান্ত হইয়া না পড়ে। শিক্ষক যদি এ বিষয়ে সচেষ্ট হন, তবে, তিনি শিক্ষার নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, যদ্দ্বারা পাঠগুলি বেশ সরস হইবে। যে পাঠ বালকের মনোরম হয়, তাহাতে সে শ্রান্ত হয় না। আমার স্মরণ আছে, বিত্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিতাম, তখন কিরূপ ক্লান্তি অনুভব করিতাম। এত শ্রান্ত হইতাম যে, শুইয়া থাকা ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিতাম না। কিন্তু দেখা যায়, আমাদের দেশে বাড়ী ফিরিয়াও ছাত্রের নিস্তার নাই। কারণ, তখনও তাহাকে পাঠাভ্যাস করিতে হয়। যখন তাহার বিশ্রাম করা উচিত বা খেলা করা উচিত, অনেক সময় তখনও তাহাকে গৃহশিক্ষকের নিকট পাঠ লইতে হয়। প্রাতঃকালে বিত্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে আবার বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করান হয়। ফলে সে পাঠে সুখ অনুভব না করিয়া ক্লেশ অনুভব করে। অনেক সময় অতি ক্ষীণ আলোকে তাহাকে গৃহপাঠ্য অভ্যাস করিতে হয়। এরূপে বালকের চক্ষু নষ্ট হয়। গৃহপাঠ একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। গৃহপাঠে যেন

শলিতার দুই দিক এক সঙ্গে ধরান হয়। এরূপে ছাত্রের জীবনকে দাসত্বে পরিণত করা হয়। বিদ্যালয়ে যতক্ষণ পড়া হয়, তাহাই যথেষ্ট এবং একদিনে বালকেরা যতটা আয়ত্ত করিতে পারে, বুদ্ধিমান্ শিক্ষক ঐ কয় ঘণ্টায় তাহা যথেষ্ট শিখাইতে পারেন। অত ঘণ্টায় যাহা শিখান না যায়, তাহা পরের দিনের জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত।

এই অত্যধিক চাপের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় বালকদিগের মধ্যে চক্ষুরোগ খুব প্রচলিত। এ সম্বন্ধে আমাদের পাশ্চাত্য দেশের সুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশে বালকদিগের শারীরিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হয়। তাহার ফলে বালকেরা সুস্থ ও সবল কায় লইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। আমি শুনিয়াছি যে, ইংলণ্ডের দরিদ্র-বিদ্যালয়ে ছাত্র-দিগকে একজন চিকিৎসক নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করেন। ঐরূপে বালকদিগের চক্ষুরোগ বা অন্যরোগ প্রথম-অবস্থায়ই ধরা পড়ে। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষে এরূপ অনেক বালক নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া তিরস্কৃত হয়, যাহারা বাস্তবিক নির্ব্বুদ্ধি নহে, কেবল কোন চক্ষু বা কর্ণের পীড়াবশতঃ পাঠে অপটু হইয়াছে।

নিদ্রা ও জাগরণ কাল নির্ণয় সম্বন্ধেও বিবেক প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য বালকের বয়স ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার তারতম্য হইবে। কোন বালকেরই ৯।১০ ঘণ্টার কম নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। শরীরের বাড় স্থগিত হইলে ৮ ঘণ্টাই যথেষ্ট। নিদ্রার সময়েই বালকের শরীরের বিকাশ হয়, অতএব নিদ্রার সময় বৃথায় যায় না।

বাহ্য বস্তু অর্থাৎ যে সকল বস্তু সর্ব্বদাই বালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাদের বালকের উপর কিরূপ প্রভাব, তাহা অল্পলোকই জ্ঞাত আছেন। চক্ষুর সাহায্যেই প্রধানতঃ বালকের চিত্ত ও মনের অনুশীলন হয়। অনাবৃত দেয়াল তাহার পক্ষে বিশেষ অপকারী। কুৎসিত চিত্র-পট আরও অপকারী। স্বীকার করি, সুন্দর গৃহসজ্জায় অনেক স্থলে অধিক ব্যয় হয়; কিন্তু এ ব্যয় অপব্যয় নয়। অনেক সময় ইহা যত্নমাত্র-সাপেক্ষ। কারণ, কদাকার ছবির মূল্যে সুন্দর ছবি কেনা যায়। অতিমাত্র পরিচ্ছন্নতার বিশেষ প্রয়োজন এবং শিক্ষক মহাশয় সুর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, যেন সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। আমার গুরুদেব শরীর

সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“শরীরকে সর্ব্বদা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখিবে, যেন এত টুকু ময়লা না থাকে।” শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই সর্ব্বদা পরিচ্ছদসম্বন্ধেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন। ইহাতে বিদ্যালয়ের শোভা ও সৌষ্ঠব রক্ষিত হইবে। এ সমস্ত বিষয়েই সতর্ক বিবেক প্রয়োগ করিতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন বালক কোন বিষয়ে পটু নহে, কিংবা যদিও বাধ্য হইয়া তাহাকে ঐ বিষয় শিখিতে হইতেছে, কিন্তু সে উহাতে আকৃষ্ট হয় না। এরূপ স্থলে বিবেকবান্ শিক্ষক, ঐ ছাত্রকে তদপেক্ষা অল্পজ্ঞ ছাত্রকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করিবেন। তাহা হইলে, কনিষ্ঠ ছাত্রকে শিক্ষা দিবার প্রয়াস জ্যেষ্ঠ ছাত্রকে ঐ বিষয় শিখিবার জন্য উৎসুক করিবে এবং যাহা পূর্ব্বে কষ্টের আকর ছিল, এখন তাহা আনন্দে পরিণত হইবে। বুদ্ধিমান্ শিক্ষক এইরূপ নানা উপায়ে ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবেন।

পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, যদি বিবেক প্রয়োগ দ্বারা বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ও সেবারত বালকদিগকে বিশ্বাসের পদবীতে স্থাপিত করা যায়, তবে কনিষ্ঠ বালকদিগকে জ্যেষ্ঠ বালকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও

সম্ভ্রমের ভাব শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইবে না। প্রেমাস্পদ ও মানাস্পদ জ্যেষ্ঠকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা, বালকদিগের একটী প্রবল বৃত্তি। এই প্রবৃত্তির সাহায্য লইয়া, বালকদিগের সৎস্বভাব পরিপুষ্ট করিতে হইবে। তাড়নের দ্বারা বালকদিগকে অসৎ-পথ হইতে নিবৃত্ত করা অপেক্ষা এ প্রণালীর উপকারিতা অধিক। যদি শিক্ষক মহাশয় বালকদিগের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, বালকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও তিনি তাহাদের সহায় থাকিবেন। আমি শুনিয়াছি যে, 'রাগ্‌বি' স্কুলে যাহারা ডাক্তার আর্‌নল্ডের ছাত্র ছিল, তাহারা পরবর্ত্তী জীবনেও বিপদের এবং সঙ্কটের সময় তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিত।

যাঁহাদিগের উপর শিক্ষক নির্ব্বাচন করিবার ভার, তাঁহাদিগের পক্ষেও এই বিবেক বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, তবে শিক্ষকদিগের উন্নত চরিত্র এবং প্রেম-প্রবণ হৃদয় অত্যাবশ্যক।

৩। নিষ্কামতা।

নিষ্কামতা।

এইবার আমরা নিষ্কামতা বা বৈরাগ্যসাধনের কথা বলিব।

নিষ্কামতা সাধন করিতে হইলে শিক্ষককে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। ছাত্রের দিক্ হইতেও এ সাধনের সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীগুরুচরণে উক্ত হইয়াছে যে,—'শ্রীগুরুর পূত দর্শনে সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়; কেবল, তাঁহার সদৃশ হইবার কামনাই অবশিষ্ট থাকে।' ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' পরম পুরুষকে দেখিলে সমস্ত কামনা নিবৃত্ত হয়। এই আদর্শকে সার করিতে হইবে, যেন সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা আমাদের নিত্য নূতন বাসনার স্থান অধিকার করে। আমাদের স্বধর্ম্মে এই ইচ্ছার প্রকাশ। যিনি প্রকৃত শিক্ষক, যাঁহার স্বধর্ম্ম অধ্যাপনা, তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা হওয়া উচিত যে, তিনি যেন সুশিক্ষক হইয়া শিক্ষাদান করিতে পারেন। বস্তুতঃ যাঁহার মধ্যে এই ইচ্ছা প্রবল নহে,

শিক্ষকতা তাঁহার স্বধর্ম্ম নহে। কারণ যাঁহারই শিক্ষকের যোগ্যতা আছে, তাঁহার মধ্যে এই ইচ্ছা থাকিবেই থাকিবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা শিক্ষকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় না এবং অনেকে শিক্ষক হন শিক্ষাদানের জন্য নহে, অথবা শিক্ষকতার যোগ্য বলিয়া নহে ; কেবল অন্য কার্য্য জুটে না বলিয়া। ইহার ফল এইরূপ হইয়াছে যে, সাধারণতঃ শিক্ষকের দৃষ্টি কেবল বেতনের প্রতি, অন্য বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না ; এবং কিরূপে বেতন বৃদ্ধি হইবে, ইহাই তাঁহার মুখ্য কামনা হয়। অবশ্য এজন্য শিক্ষক কতক দোষভাগী বটেন, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীই মুখ্যতঃ দায়ী। নিজের এবং পরিবারের ভরণের জন্য পর্য্যাপ্ত আয় শিক্ষকের থাকা উচিত এবং এরূপ আয়ের কামনা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। জাতি সাধারণের দেখা উচিত যে, শিক্ষকের এরূপ অবস্থা না হয়, যেন তাঁহাকে সর্ব্বদা আয়বৃদ্ধির ভাবনা ভাবিতে হয় ; অথবা আয়ের অকুলান বশতঃ গৃহশিক্ষকতা করিতে হয়। আয়ের স্বচ্ছলতা হইলে তবেই শিক্ষক আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন এবং আপন পদের গৌরব অনুভব

করিবেন, অন্য শিক্ষকের তুলনায় তাঁহার অবস্থা যেরূপই হউক না কেন। সত্য কথা বলিতে কি, এখন বেতনের পরিমাণেই প্রধানতঃ শিক্ষকের মর্য্যাদার তৌল হয়। যিনি বাস্তবিক সন্তুষ্ট ও সুখী, তিনিই সুশিক্ষক হইতে পারেন।

শিক্ষক যেন ছাত্রকে আপনার পথে সবলে চালিত করিয়া খ্যাতি অর্জ্জনের কামনা না করেন। তাঁহার দেখা উচিত, কোন্ বালকের কি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রতিভা আছে এবং কোন্ পথে গেলে সে সবিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারে। অনেক সময় শিক্ষকেরা স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি অতি মনোযোগ দিয়া ভুলিয়া যান যে, বালককে আরও আরও বিষয় শিখিতে হইবে। যে বিষয়ে যে বালকের স্বাভাবিক টান, তাহার পক্ষে সেই বিষয়ের উপরই ঝোঁক দেওয়া উচিত। শিক্ষকেরা যদি না পরস্পর একযোগে কায করেন, তবে বালকের উপর বেশী ভার পড়ে। কারণ প্রত্যেক শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ে ঝোঁক দেন এবং সেই বিষয়ে গৃহপাঠ্য নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত– শিক্ষক অনেক, ছাত্র এক।

শিক্ষকের পক্ষে পরীক্ষার সুফল দ্বারা যশোলাভ অপেক্ষা ছাত্রের কল্যাণ কামনা করাই উচিত। অনেক স্থলে অপ্রস্তুত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা আর এক বৎসর সেই শ্রেণীতে থাকিয়া পাঠ্য বিষয়ে সুদক্ষ হওয়া ছাত্রের পক্ষে কল্যাণকর। এরূপ স্থলে ছাত্রকে সেই শ্রেণীতেই রাখা উচিত। কিন্তু পর বৎসরে সুফল দেখাইয়া শিক্ষক যশস্বী হইবেন, এজন্য ছাত্রকে সেই শ্রেণীতে রাখা সঙ্গত নহে। অন্য পক্ষে যে স্থলে পিতামাতা ছাত্রের ক্ষমতা না বুঝিয়া, তাহাকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করিতে চাহেন এবং পাঠ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে 'প্রোমোসান্'কে শ্রেয়স্কর মনে করেন, সে স্থলে শিক্ষককে তাহাদের কার্য্যে বাধা দিতে হয়।

শিক্ষক যদি না পূর্ণরূপে নিষ্কাম হন, তাহা হইলে তাঁহার কামনা তাঁহাকে তাঁহার অধীনস্থ ছাত্রদিগের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার প্রতি অন্ধ করিবে এবং তাহাদিগের প্রকৃতিগত অভিব্যক্তির অনুকূল না করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী করিবে। অনেক সময় হয় ত' শিক্ষক মহাশয় নিজে কোন বৃত্তিবিশেষের বা মত-

বিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে এরূপ নিষ্কাম হইতে হইবে যে, যদিও তিনি সাধারণভাবে ছাত্রদিগকে সদ্ভাবের জন্য প্রণোদিত করিবেন, কিন্তু কোন মতবিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন না; অথবা তাহাদিগের সহৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসকে অনভিজ্ঞতা বশতঃ সংকীর্ণ ঐক-দেশিকতায় পরিণত হইতে:দিবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে সাধারণ ভাবে রাজনীতি শিখাইবেন; কিন্তু দলাদলির পক্ষপাতী করিবেন না। তিনি শিখাইবেন যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য সকল বৃত্তি রই উপযোগিতা আছে; কিন্তু সেই বৃত্তি সম্মানের সহিত পালন করা চাই। অতএব কোন এক বৃত্তি অন্য বৃত্তির অপেক্ষা খাট নহে।

৪। শীল।

শীল।

আমার গুরুদেব ষট্ সম্পত্তির নাম দিয়াছেন—শীল বা সদাচরণ। এই ষট্‌সম্পত্তির নাম, যথা—

১। মনঃসংযম (শম)

২। কর্ম্মসংযম (দম)

৩। সহিষ্ণুতা (তিতিক্ষা)

৪। সন্তোষ (উপরতি)

৫। একাগ্রতা (সমাধান)

৬। পূর্ণ বিশ্বাস (শ্রদ্ধা)

একে একে আমরা এই ছয়টীর আলোচনা করিব।

(১) মনঃসংযমঃ—শিক্ষকের পক্ষে ইহা একটী অতি প্রয়োজনীয় সাধন; কারণ, মনের দ্বারাই প্রধানতঃ তিনি ছাত্রদিগকে চালিত ও প্রণোদিত করেন। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন যে, মনঃসংযম বলিলে প্রথমতঃ চিত্তের স্থৈর্য্য বুঝায়, যেন আমরা কোন

কিছুতে ক্রোধ না করি এবং অধৈর্য্য না হই। বলা বাহুল্য যে, শিক্ষক যদি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ ও অধৈর্য্য হন, তবে তদ্দ্বারা ছাত্রদিগের বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। সত্য বটে, অনেক সময় বিদ্যালয়ের বাহিরের ঘটনাই শিক্ষকের ক্রোধ ও অধৈর্য্যের কারণ, কিন্তু তাহা বলিয়া ছাত্রদিগের উপর ইহার কু ফল কম হয় না। অকিঞ্চিৎকর-কারণ-জনিত শিক্ষকের ঐরূপ মনোভাব ছাত্রদিগের মনে সংক্রামিত হয়। অতএব যে শিক্ষক প্রায়ই অধৈর্য্য এবং ক্রুদ্ধ হন, তিনি ছাত্রদিগের চরিত্রে ক্রোধ ও অধৈর্য্যের বীজ বপন করেন। পর-বর্ত্তী জীবনে ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, তাহাদিগের সুখশান্তি নষ্ট করে এবং আত্মীয় স্বজনের জীবনকে তিক্ত করিয়া তুলে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অনেক সময় বাড়ীর দুঃখকষ্টের ফলে ছাত্রেরা অসন্তুষ্ট ও বিরক্তচিত্তে বিদ্যালয়ে আসে। এরূপে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই অধৈর্য্য ও ক্রোধের ভাব সঙ্গে করিয়া আনেন, যাহা বিদ্যালয়ময় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং যে সকল পাঠ সহজ ও সুখদ হওয়া উচিত, তাহাকেও কঠিন ও তিক্ত করিয়া তুলে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রথমভাগে আমরা যে উপাসনার কথা

বলিয়াছি, শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই তাহাতে উপস্থিত থাকা উচিত। কারণ, তাহার ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মন হইতে ঐ সকল অশুভ চিন্তা ও ভাব বিদূরিত হইবে। তখন ছাত্র ও শিক্ষকের মিলিত চেষ্টায় বিদ্যালয় আনন্দধামে পরিণত হইবে। তখন পূর্ব্বাহ্ণে সেই সুখশান্তিময় স্থানের সকলে প্রতীক্ষা করিবেন এবং অপরাহ্ণে সেই স্থান ত্যাগ করিতে সকলেরই অনিচ্ছা হইবে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, চিত্তসংযমের অভাব শিক্ষককে অনেক সময় অন্যায়ে প্রবর্ত্তিত করে এবং তাহার ফলে ছাত্রেরা অশান্ত ও শ্রদ্ধাহীন হয়। জ্যেষ্ঠের ন্যায়বুদ্ধির প্রতি যদি না কনিষ্ঠের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে, তবে কোন বালকই প্রকৃত উন্নতি করিতে পারে না, অথবা প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতে পারে না। এই বিশ্বাসহীনতাই আধুনিক ছাত্রজীবনের ব্যাধি। ফলে, গুরুশিষ্যের মধ্যে চিত্তের ব্যবধান দূর করিতেই কত সময় অপব্যয় হয়। শিক্ষকের ধৈর্য্য থাকিলে, এই সকল ব্যবধানের সৃষ্টিই হয় না।

ক্রোধ ও অধৈর্য্যের উৎপত্তি বদ্ মেজাজ হইতে। ছাত্রদিগের যেমন শিক্ষকদিগকে বুঝা চাই, শিক্ষকদিগেরও সেইরূপ ছাত্রদিগকে

বুঝা চাই। রুক্ষ মেজাজ এই বুঝাবুঝির প্রধান অন্তরায়। "শিক্ষক মহাশয় আজ রাগান্বিত হইয়াছেন", "শিক্ষক মহাশয় আজ উগ্রভাব ধারণ করিয়াছেন", "শিক্ষক মহাশয় আজ সহজেই ক্রুদ্ধ হইতেছেন", ছাত্রদিগের মুখে প্রায়ই এই সকল কথা শুনা যায়। ইহার ফলে বিদ্যালয়-গৃহে একটা অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি হয় এবং শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শিখে এবং তাঁহার ভাববিকার হইতে আত্ম-রক্ষা করে। এইরূপে অবিশ্বাস শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে। যে শিক্ষক যে পরিমাণে ছাত্রদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ, তাঁহার মূল্য তত বেশী। যে শিক্ষকের রুক্ষ স্বভাব, তিনি ছাত্র-দিগের শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত থাকেন।

কিশোর-বয়স্ক ছাত্রদিগের সম্বন্ধে এই সকল কথা বিশেষভাবে খাটে; কারণ, তাহারা স্বভাবতই শিখিতে উৎসুক এবং ভক্তি-প্রবণ। শিশুর এই ঔৎসুক্য যিনি রাগের দ্বারা রুদ্ধ করেন, শিক্ষক হওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অনুচিত। স্বীকার করি যে, বড় বালকের অপেক্ষা ছোট বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া অধিক কষ্টসাধ্য। কারণ,

কিরূপে চেষ্টা করিতে হয়, তাহা তাহারা এখনও জানে না; আর যদিই বা জানে, তবে সে চেষ্টাকে সংযত ও নিয়মিত করিতে পারে না। সেইজন্য বড় বালক অপেক্ষা ছোট বালককে বেশী যত্ন করিতে হয়। কারণ, বড় বালকেরা অনেকটা নিজেকে নিজে সাহায্য করিতে পারে। শিশুর অসংযত চেষ্টাকে সর্ব্বক্ষণ চিত্তাকর্ষক কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া, তাহাকে সৎপথে চালিত করা কম আয়াসের ব্যাপার নহে; কারণ, শিশুর উৎসাহকে সহানুভূতির দ্বারা চালিত না করিয়া যদি রুক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তবে সে উৎসাহ শীঘ্রই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে এবং সে বালক নিরুৎসাহ এবং অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে।

আমি কোথা যেন পড়িয়াছি যে, কৈশোরই উৎসাহ ও উচ্চ আদর্শের জন্মভূমি; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উহা ক্রমশঃ কমিয়া আসে; শেষে প্রৌঢ় বয়সে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রকৃত উৎসাহ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না, প্রকৃত উৎসাহ কখনও অবসাদে পরিণত হয় না; বরং বয়োবৃদ্ধির সহিত আরও সবল এবং সার্থক হয়। শিশু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া

আসিয়াছে এবং ঐক্যের ভাব সঙ্গে বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার ঐ ভাবকে পরিপুষ্ট করা উচিত, যেন ইহা জীবনব্যাপী হয়। ক্রোধ ও রুক্ষতা অনৈক্য-প্রসূত। উহাদের নিকট ঐক্যভাব তিষ্ঠিবে কিরূপে? আত্মসংযমের ফলে স্থৈর্য্য, উৎসাহ এবং একাগ্রতা লাভ হয়। কি গৃহে কি বিদ্যালয়ে, যত বাধা বিপত্তি শিক্ষককে প্রতিহত করুক না, বীরভাবে এবং ধীরভাবে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইবেন। এরূপ করিলে কেবল যে তাঁহার নিজের অশান্তির ক্ষয় হইবে, তাহা নহে, তিনি ছাত্রদিগকেও উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিবেন এবং তাহাদিগকে বীর ও ধীর হইতে সহায়তা করিবেন। বাধার বিষয়ে অধীর হইলে, বাধা আরও বহুল হয়। ভাবী বিঘ্নের কল্পনা করিলে অর্থাৎ মিসেস্ বেসাণ্ট্ যাহাকে বলিয়াছেন—সেতুতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সংকল্প দ্বারা সেতু পার হইলে, বিঘ্ন আরও ঘনীভূত হয়। শিক্ষক যদি নিজের বিঘ্ন সম্বন্ধে বীরভাব ও ধীরভাব অবলম্বন না করেন, তবে তিনি ছাত্রদিগকে বিঘ্নবাধা বীরভাবে উত্তরণ করিতে কিরূপে সাহায্য করিবেন? স্থির চিত্তের

নিকট অনেক বিঘ্নই খাটো হইয়া যায়। যে বালক এইভাবে পাঠে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পাঠ অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। অশান্ত ও বিরক্তচিত্তে পাঠ গ্রহণ করিলে এরূপ হয় না। সাহস ও ধীরতার ফলে আত্মনির্ভর আইসে। যে আত্মনির্ভর শিখিয়াছে, বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সে কর্ত্তব্যবিমুখ হইবে না, এরূপ ভরসা তাহার উপর করা যায়।

মনঃসংযম বলিলে ইহাও বুঝায় যে, যখন যাহা করিতে হইবে, তৎপ্রতি চিত্তের সমাধান করিতে হইবে। আমার গুরুদেব মনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'মনকে চঞ্চল হইতে দিবে না। যে কার্য্য যখন করিবে, তখন তাহাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিবে, যেন ইহা স্বমুষ্ঠিত হয়'। ছাত্রেরা পাঠে যথোচিত মনোযোগ দেয় না, সেইজন্য বিদ্যালয়ে বহু সময় অপব্যয় হয়। কিন্তু শিক্ষক নিজে যদি না পাঠে চিত্ত সমাধান করেন, তবে ছাত্রদিগের মন ত চঞ্চল হইবেই। উপাসনা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদির উদ্দেশ্য এই মনঃসংযম শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু ইহা দিনের মধ্যে একবার কি দুইবার মাত্র করা হয়। আমার গুরুদেব যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন,

সেইরূপে প্রত্যেক ব্যাপারে চিত্ত-সমাধান করিয়া, যদি না সারাদিন মনকে সংযত করা হয়, তবে আমরা কখনই মনের উপর সম্পূর্ণ বশিত্ব লাভ করিতে পারিব না এবং মন কখনও আমাদের স্বেচ্ছাচালিত যন্ত্রে পরিণত হইবে না।

ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন বিপত্তির কথা লইয়া শিক্ষকের সমীপস্থ হয়। এইরূপে তাঁহার মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে দ্রুত নিক্ষেপ করিতে হয়—শিক্ষকতা কার্য্যের ইহা একটী অতি কঠিন ব্যাপার। শিক্ষকের চিত্ত তাঁহার এতদূর স্ববশ হওয়া উচিত, যেন প্রত্যেক বালকের বিষয়ে তিনি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন এবং সমান যত্ন ও আগ্রহে এবং কোনরূপ অধৈর্য্য না হইয়া এক প্রশ্নের পর অন্য প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন। তিনি যদি এইরূপে পূর্ণ মনোযোগ দিতে না পারেন, তবে তিনি যে উপদেশ দিবেন, তাহা নিশ্চয়ই অনেক সময়ে ভুল হইবে, অথবা তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুচিত হইবে। ইহার ফলে প্রচুর বিপত্তি ঘটা অসম্ভব নহে।

এ সম্বন্ধে আমার বন্ধু কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সুপরি-

চিত অধ্যক্ষ মিঃ জি এস্ অরণণ্ডেল এইরূপ লিখিয়াছেন:—
"অবশ্য ছাত্রেরা দিনের মধ্যে বারংবার তাহাদিগের অভিযোগ ও আবেদন লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রত্যেক বালকের সম্বন্ধে এবং তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাকে পূর্ণ মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ যদিও ঐ সকল আবেদন, অভিযোগ ও আপত্তি অনেক সময়ে অতি অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক, তথাপি যদি সে বিষয়ে আমি অমনোযোগী হই, তবে তদ্দ্বারা ঐ বালকের বিষম চিত্তক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয়। ফলে, যদিচ সকল সময় বালকের চিত্তক্ষোভের প্রতিবিধান করিতে পারা না যায়, তাহাকে তুষ্ট করা কঠিন নহে। চিত্তের উপর এরূপ সংযম রাখা উচিত, যেন শিক্ষক বারংবার বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোযোগী হইতে পারেন এবং যেন সহর্ষে এই কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। শিক্ষকের পক্ষে ইহা কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই। আমরা অনেক সময় বলি, আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। প্রকৃত কথা এই, আমাদের মনোযোগের অভাব হইতেছে। কারণ অধৈর্য্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া

উচিত, তাহা হইতে রম্যতর বিষয়ে মন সংযুক্ত হইতে চাহিতেছে।”

বালকেরা যখন যাহা করিবে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে নিবিষ্ট-চিত্ত হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ, বালকের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। জগতে কত না চিত্তাকর্ষক বস্তু রহিয়াছে; বালকের পক্ষে সমস্তই নূতন এবং মনোহারী। সেইজন্য নূতন বিষয় দৃষ্টিপথে পড়িলেই, তাহার মন তৎপ্রতি ধাবিত হয়। বালককে সর্ব্বদা ঈক্ষণ করিতে বলা হয়। সে সানন্দে তাহা করে। কিন্তু যখন তাহাকে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়, তখন সে সেই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করিয়া চিত্তকে সমাহিত করিতে বাধ্য হয়। এই প্রত্যাহার-কার্য্য প্রথম প্রথম তাহার কাছে খুব কঠিন বোধ হয়। শিক্ষকের উচিত, তাহাকে এই নূতন ভাবে অভ্যস্ত হইবার জন্য সাহায্য করা। অনেক সময়ে বালক শ্রান্তিবশতঃ একমন হইতে পারে না। শিক্ষকের উচিত, তখন তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া। কখনও বিষয়ের নীরসতা-বশতঃ বালকের চিত্ত একাগ্র

হয় না। তখন শিক্ষকের উচিত, নূতন ভাবে সেই বিষয়কে বুঝাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ বালকেরা ইচ্ছা করিয়া অমনোযোগী হয় না। বালক-সুলভ এই চঞ্চলতায় শিক্ষকের অধীর হওয়া উচিত নহে। অন্ততঃ শিক্ষক সতর্ক হইবেন, যেন তাঁহার দোষে, তাঁহার অক্ষমতায়, বালক অমনোযোগী না হয়।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মনোযোগ এই ভাবে নিয়মিত হইলে, ছাত্রজীবন পূর্ণতর এবং উজ্জ্বলতর হইবে এবং অসংযত চিত্তে যে নানা কু-চিন্তা উদ্ভূত হয়, তাহার অবকাশ থাকিবে না। যখন মন বিশ্রাম করিতে চায়, তখন মনকে সম্পূর্ণ নিরাধার করিবার আবশ্যক নাই। গুরুদেবের কথায় বলি—"মন যেন অলস না থাকে, মনের পশ্চাতে সর্ব্বদা সাধুচিন্তা রাখিয়া দিবে—যেন সুযোগ পাইলেই সেই সমস্ত চিন্তা মনকে অধিকার করিতে পারে।"

সংযত মনকে কিরূপে অপরের সাহায্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, গুরুদেব তাহাও বুঝাইয়াছেন।—"প্রত্যহ এমন লোকের কথা চিন্তা করিবে, যে শোকে, দুঃখে অথবা সাহায্যের অভাবে জর্জ্জরিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া আছে—তোমার হৃদয়ের সকরুণ চিন্তা

তাহার উপর বর্ষণ করিবে।” শিক্ষকেরা বোধ হয় অবগত নহেন যে, এই ভাবে তাঁহারা কি প্রবল শক্তির প্রয়োগ করিতে পারেন। বাক্যের দ্বারা এবং কার্য্যের দ্বারা যতদূর পারেন, চিন্তার দ্বারা তাঁহারা বালকদিগকে তদপেক্ষা অধিক প্রণোদিত করিতে পারেন। এইরূপে সদয় এবং সস্নেহ চিন্তার ধারা বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রবাহিত করিয়া তাঁহারা সকল বালকের চিত্ত অধিকতর শান্ত এবং সানন্দ করিতে পারেন এবং একটীও বাক্য ব্যয় না করিয়া, তাঁহারা সমস্ত বিদ্যালয়ের ভাব উন্নত করিতে পারেন।

এইরূপে সু-চিন্তার প্রভাব বিদ্যালয় হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়া উচিত। দেখা যায়, যাঁহারা বালকদিগের সাহচর্য্য করেন, তাঁহারা নিজেদের বালকভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং প্রৌঢ় লোকের সহবাসীদের অপেক্ষা অধিক দিন যৌবন-সুলভ উচ্চ আদর্শ ও পবিত্র উত্তেজনা সঞ্জীবিত রাখিতে পারেন। সেইরূপ যে গ্রামে বা জিলায় কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেন তাহার সান্নিধ্য হেতু সেই গ্রাম বা জিলা আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়। যেন সেই বিদ্যালয় হইতে হ্লাদকর ও শান্তিময় চিন্তাস্রোত চতু-

দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত আকাশকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে এবং পরিপার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত করে। ফলতঃ সেই বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের ফলে যেন দীন দুঃখীর সুখ, রোগীর স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধের সম্মান উপচিত হয়।

এই সকল বিষয়ে শিক্ষক যদি সর্ব্বদা ছাত্রদিগের সহিত আলাপ করেন এবং সময়ে সময়ে তাহাদের সমক্ষে এই ভাবের কল্পনা-চিত্র উপস্থিত করেন এবং যদি তাহারা সকলে মিলিয়া ঐ ধরণে চিন্তা করে, তবে ইহা হইতে অনেক মঙ্গল হইতে পারে। কারণ, চিন্তার শক্তি সত্য সত্যই অমোঘ; বিশেষতঃ যখন অনেকে মিলিয়া এক বিষয়ে চিন্তা প্রয়োগ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোথাও কোন প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহাতে অনেকের দুঃখ দৈন্য ঘটিয়াছে, তবে শিক্ষক ধর্ম্মশিক্ষার অবসরে সেই বিষয়ে ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং সেই আর্ত্তদিগের উদ্দেশে প্রেমের ও উৎসাহের চিন্তা প্রয়োগ করিবার জন্য তাহাদিগকে তাঁহার সহযোগী হইতে আহ্বান করিবেন।

গুরুদেব চিত্তসংযম সম্বন্ধে শেষ কথা এই বলিয়াছেন—"দম্ভ

হইতে মনকে অন্তরে রাখিবে, কারণ অজ্ঞান হইতেই দম্ভের উৎপত্তি"। দম্ভ এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান-জনিত আনন্দ এক জিনিস নহে। দম্ভের উৎপত্তি অনৈক্য হইতে, দ্বৈতবুদ্ধি হইতে—'আমি অপরের অপেক্ষা ভাল করিয়াছি'। সৎকর্ম্ম-জনিত আনন্দের উৎপত্তি ঐক্যবুদ্ধি হইতে—'আমি অপরের সেবার জন্য ইহা করিয়াছি—এই আমার আনন্দ।' দম্ভ মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করে। দম্ভের ফলে মানুষ ভাবে, আমি অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সৎকর্ম্ম-জনিত আনন্দ আমাদের উপকারী এবং উৎসাহ-বর্দ্ধক। ঐ আনন্দ কর্ত্তাকে আরও কঠিনতর কার্য্যে প্রণোদিত করে। যে জ্ঞান আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, যখন অপরকে তাহার ভাগী করি, তখন দম্ভের ভাব চলিয়া যায় এবং অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব, এই ইচ্ছার পরিবর্ত্তে অপরের আরও উপকার করিতে পারিব, এই আশয়ই আমাদিগকে জ্ঞানার্জ্জনে প্রণোদিত করে।

(২) কর্ম্মসংযমঃ—গুরুদেব বলিয়াছেন—"দীর্ঘসূত্রতা একেবারে ছাড়িতে হইবে, সাধুকার্য্যে অবিশ্রাম উদ্যম চাই। কিন্তু তোমার যাহা

নিজের কর্ত্তব্য, তাহারই অনুষ্ঠান করিবে,অন্য কাহারও নহে। তবে যদি সে ব্যক্তির অনুমতিক্রমে তাঁহার সাহায্যের জন্য কিছু কর, তবে সে স্বতন্ত্র কথা"। এ সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। কারণ, তিনি এক পক্ষে ছাত্রদিগের স্ব স্ব প্রকৃতির অনুযায়ী বিকাশের পক্ষে বিঘ্ন করিবেন না এবং তাহাদের পরিণতির পথে বাধা দিবেন না কিংবা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মের বিপরীতে চালিত করিবেন না; অন্য পক্ষে তিনি সতর্কভাবে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, সযত্নে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন এবং (গুরুদেবের কথায়) মৃদুভাবে তাহাদিগের দোষের সংশোধন করিবেন। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে যতক্ষণ পড়ে, ততক্ষণ তাহাদিগের ভার শিক্ষকের উপর; অতএব তিনি ঐ সময়ে তাহাদিগের পিতামাতার স্থান গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষক মহাশয়ের আত্মসংযমের বিশেষ প্রয়োগস্থল ছাত্রদিগের স্ব স্ব প্রকৃতির অনুযায়ী তাঁহার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা। ছাত্রদিগের উদ্যম যখন ঠিক পথে চলিতেছে, শিক্ষক তখন কেবল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

কিন্তু যদি সেই উত্তম অতিমাত্র হয়, তবে তিনি যথাসম্ভব ধীরভাবে তাহাদিগকে সংযত করিবেন; যদি নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগকে সজীব করিবেন; যদি বিপথে গিয়া থাকে, তবে নূতন পথে চালিত করিবেন। এইরূপে যেখানে তাঁহার মধ্য-বর্ত্তিতার আবশ্যক হইবে, সেখানে তিনি এরূপ ভাবে কার্য্য করিবেন, যেন ছাত্রদের মনে হয়, যে তাহারা যে পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু যাইতে পারিতেছিল না, তিনি সেই পথই দেখাইয়া দিলেন। এরূপ যেন না তাহাদের মনে হয় যে, তিনি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আপন পথে চালিত করিলেন। দেখা যায় অনেক বালক যথোচিত চরিত্রবল লাভ করিতে পারে নাই; তাহার কারণ এই যে, শিক্ষক মহাশয় বারংবার বাধা দিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপন জ্ঞান দ্বারা তাহাদিগকে চালিত করিয়াছেন, তাহাদের নিজের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হইবার অবকাশ দেন নাই। এইরূপে বালকেরা তাঁহারই উপর নির্ভর অভ্যাস করিতে শিখিয়াছে, আপন আপন পায়ে ভর দিতে শিখে নাই।

শিক্ষকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, যেন বাহিরের কার্য্যে

অনুরাগবশতঃ তিনি বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্যে অবহেলা না করেন। অনেক শিক্ষক বুঝেন না যে, পারিবারিক কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যাহা কিছু সময় অবশিষ্ট থাকে, সমস্তই বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত। অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ে যে টুকু কাজ না করিলে নয়, সেইটুকু মাত্র সারিয়াই, যে কাঁযে তাঁহাদের বেশী অনুরাগ, সেই কার্য্যের জন্য ধাবিত হন। মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষা-কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে, উহাই শিক্ষকের মুখ্য কার্য্য হওয়া উচিত এবং ছাত্রদিগের জন্যই তাঁহার সমস্ত সময় ব্যয় করা উচিত আর তাহাদিগের সঙ্গে অথবা তাহাদিগের জন্য কার্য্য করিতে তাঁহার সমধিক আনন্দ অনুভব করা উচিত।

আমরা শুনিতে পাই যে, কি ব্যবসায়ী, কি রাজপুরুষ, কি রাজ-নীতিজ্ঞ, উৎসাহী ও একাগ্র না হইলে কেহই সফলতা লাভ করিতে পারেন না। শিক্ষাকার্য্যে সাফল্য লাভের জন্যও ঐ দুইটী গুণের আবশ্যক। যিনি শিক্ষাকার্য্যের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কেবল যোগ্য ব্যক্তি হইলেই চলিবে না, তাঁহার উৎসাহী ও একাগ্র হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অর্থোপার্জ্জন ও ক্ষমতা লাভের জন্য লোকে যে উৎসাহ ও একাগ্রতা ব্যয় করে, শত শত কিশোর-জীবন গঠন-কল্পে ততোধিক উৎসাহ ও একাগ্রতা প্রয়োগ কি উচিত নহে? শিক্ষক যতক্ষণ ছাত্রের সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন। কারণ, ভারতের চিরন্তন শিক্ষাই এই যে, সৎসঙ্গের দ্বারা লোকের উন্নতির সহায়তা হয়। বিদ্যালয়ের বাহিরেও শিক্ষকের সর্ব্বদা ছাত্রদিগের বিষয় ভাবা উচিত এবং তাহাদের উন্নতির উপায় চিন্তা করা উচিত। শিক্ষা ছাড়া যদি অন্য বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ থাকে, এবং তাহাতেই তাঁহার সমস্ত মন নিযুক্ত হইয়া যায়, তবে তিনি এরূপ করিবেন কি করিয়া?

এ বিষয়েও আরণ্ডেল সাহেবের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি :—"প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আমার প্রথম চিন্তা এই হয় যে, আজিকার দিনে কি কি করণীয় আছে; বিশেষতঃ আমাকে কি কি করিতে হইবে। তখন স্কুল ও কলেজের বিষয় একবার দ্রুতগতিতে মনে ছকিয়া লই এবং দেখি যে, কোন্ ছাত্রকে বিশেষভাবে সাহায্য করা আবশ্যক; আমার নোটবইয়ে তখনই

তাহার নাম লিখিয়া লই, যেন দিনের মধ্যে তাহাকে ডাকাইতে না ভুলি। পরে কলেজ বসিবার পূর্ব্বাহ্নে এবং অন্য কোনও কার্য্য করিবার আগে, সে দিন আমাকে যে পাঠ দিতে হইবে, তাহা দেখিয়া লই ; দেখি, আমি ঠিক প্রস্তুত আছি কি না। ইতিমধ্যে ছাত্রেরা দলে দলে আসিতে থাকে, কেহ প্রশ্ন করে, কেহ নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলে, কেহ বাধা বিপত্তির কথা বলে, কেহ বা নিজের সামান্য অসুখের কথা বলে। আমার একটী নিজস্ব ছোট ঘর আছে যেখানে আমি ঐ যুবকদের সহিত দেখা করি। সেখানে অন্য কোন কার্য্য করি না, পাছে তাহাতে ঐ ঘরের পবিত্র ও সাত্ত্বিক ভাব নষ্ট হয়। প্রত্যেক বালকের উপর আমার চিত্ত একাগ্র করি, তখন অন্য কোন বিষয়ে মন দিই না এবং প্রত্যেক বালক যদি না হাসিমুখে সেই গৃহ পরিত্যাগ করে, তবে আমি তুষ্ট হই না।”

যে শিক্ষক এই ভাবে কার্য্য না করেন, কি যে পবিত্র ও গুরুতর ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যিনি না বুঝেন যে, শিক্ষা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি যথার্থই

ভগবানের ও জন্মভূমির সেবা করিতেছেন, তিনি শিক্ষক নামের যোগ্য নহেন। তাঁহার ত্যাগের জীবনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইলে, ছাত্রেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে উন্মুখ হয় এবং এইরূপে তাহাদের মনে শ্রদ্ধা ও দেশ-ভক্তির উন্মেষ হয়। সকল ছাত্র ঈশ্বরের সন্তান, ন্যাসরূপে তাঁহার হস্তে অর্পিত আছে; তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। তিনি যদি নিজের সমস্ত সময় ও চিন্তা স্বধর্ম্ম পালনে নিয়োজিত না করেন, তিনি যদি ঐ সকল ছাত্রকে ঈশ্বরভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি এবং দেশের সেবা করিবার শক্তি অর্জ্জন না করাইয়া, বিদ্যালয় হইতে বিদায় দেন, তবে তিনি ঈশ্বরের নিকট এবং দেশের নিকট দায়ী। শিক্ষকের ন্যায় ছাত্রকেও কর্ম্মসংযম শিখিতে হইবে। যেন অন্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন কার্য্যে অবহেলা না করে। গুরুদেব তাঁহার সেবকদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"তোমরা অন্যলোকের অপেক্ষা মন্দ নহ, ভাল করিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করিবে।"

ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য অধ্যয়ন। কোন কারণে যেন সে অধ্যয়নে অবহেলা না করে। অধ্যয়নের অবসরে অন্য যে সকল

ব্যাপারে লিপ্ত হইলে বালকদিগের উপকার আছে, এমন সকল ব্যাপারের আয়োজন শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের মধ্যেই ব্যবস্থা করিবেন। কারণ ছাত্রদিগের সমস্ত চেষ্টা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। যদি শিক্ষক মহাশয় মনে করেন যে, কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে ছাত্রদিগের সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়, তবে তিনি বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাহার শাখা প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং তিনি এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ভারত সন্তান' (Sons of India) ও বালক ফৌজ (Boy Scout) অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উভয়ই জাতীয় শুভ অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়সমূহে তাহার বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। শিক্ষক ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিবেন, যেন তাহারা মনে করে যে, শিশুর পক্ষে পিতৃগৃহ যেমন সমস্ত চেষ্টার কেন্দ্র, সেইরূপ কিশোরের পক্ষে বিদ্যালয়ই সমস্ত চেষ্টার কেন্দ্র। শিশু যেমন গৃহ হইতে তাহার প্রাণ ও শক্তি আহরণ করে, কিশোর সেইরূপ বিদ্যালয় হইতেই তাহার প্রাণ ও শক্তি আহরণ করিবে। বিদ্যালয়ে সর্ব্ববিধ শুভ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেন

বালকের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়েরও শিক্ষা হয় এবং সমস্ত অনুশীলনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। বিদ্যালয়ের সম্পর্কে বাদ-সমিতি (Debating Society) থাকা উচিত এবং ঐ সমিতিতে বাদানুবাদের নিয়ম সযত্নে পালিত হওয়া উচিত যেন বালকেরা তর্কবিতর্কেও আত্মসংযম শিখিতে পারে। বিদ্যালয়ে নাট্যসমিতি থাকা উচিত, যেখানে বালকেরা ভাব সংযম শিখিতে পারে। ব্যায়াম-সমিতি থাকা উচিত যেখানে তাহারা চিত্ত-সংযম ও চেষ্টা-সংযম শিখিতে পারে। সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত যেখানে সাহিত্যানুরাগী ছাত্রগণ সেই সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে পারে। সাহায্য-সমিতি থাকা উচিত, যদ্দ্বারা দুঃস্থ বালকদিগের সাহায্য হইতে পারে।

ছাত্রেরা যাহাতে স্বদেশের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে, বিদ্যালয়ে তাহার সুযোগ থাকা উচিত। এইরূপে তাহারা রাজনীতির চর্চ্চা না রয়াও দেশভক্তির অনুশীলন করিতে পারিবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে অনেক সময় সুকুমার-মতি বালকেরা বিবেক-বিহীন আন্দোলনকারীদিগের নিকট শিক্ষা পায় যে নিজের দেশকে ভাল

বাসিতে হইলে, অন্য দেশকে ঘৃণা করা আবশ্যক। বিদ্যালয়ের মধ্যেই যদি দেশভক্তির অনুষ্ঠান থাকে এবং বালকদিগের সমুচিত উৎসাহ-স্রোত অনুচিত খাদে প্রবাহিত হইতে না দেওয়া হয়, তবে ঐ সকল কু উপদেশ তাহারা কখনও গ্রহণ করিবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি তাহাদের উৎসাহের ক্ষেত্র বিদ্যমান না থাকে, তবেই তাহারা বাহিরে সে ক্ষেত্র খুঁজিয়া বাহির করিবে।

ছাত্রদিগের শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ছাত্রদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সেবাসংঘ গঠিত করা উচিত। যেমন পশুরক্ষা-সংঘ, আহতের আশুপ্রতীকার-সংঘ, নিম্নশ্রেণীদিগের শিক্ষা-সংঘ, জাতীয় বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পর্ব্বকালে সেবা-সংঘ ইত্যাদি।

বালকদিগের জন্য যদি এই সকল কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যালয়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে আর তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে সে সকল অনুষ্ঠান করিবে না।

বালকেরা যখন ব্যায়াম ক্রীড়া করে, সেই সময় তাহাদিগের কর্ম্মসংযম অভ্যাস করিবার বিশেষ সুযোগ। পাঠাগারে তাহারা

শিক্ষকের শাসনে থাকে ; ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ শাসন-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। অতএব যদি তাহারা তখন বহিঃশাসনের স্থলে আত্ম সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহাহইলে দেখা যাইবে যে, প্রবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ বালকদিগের পক্ষে আত্মসংযম শিক্ষা করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং যদি শিক্ষকেরা সেখানে উপস্থিত থাকিয়া আপনারা ক্রীড়াধ্যক্ষের আজ্ঞাধীন হন এবং ক্রীড়ার সময় যথোচিত সম্মান ও ধীরভাব প্রদর্শন করেন আর নিজের জন্য না করিয়া দলের জন্য উদ্যম করেন, তবে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বালকেরা আত্মসংযম শিক্ষা করিতে পারিবে।

ঐরূপ করিলে শিক্ষককে ছাত্রেরা নূতন চক্ষে দেখিবে। তাহারা দেখিবে যে শিক্ষক মহাশয় আর শিক্ষক-ভাবে তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন না। কিন্তু তিনি নিজেকে নিজে শাসন করিতেছেন এবং ক্রীড়ার নিয়ম দ্বারা নিজে শাসিত হইতেছেন আর নিজের দলের স্বার্থের জন্য নিজের চেষ্টার প্রয়োগ করিতেছেন। কোন বালক হয় ত অপরের অসুবিধা করিয়াও নিজের আমোদের জন্য

ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ছিল। সেও শিক্ষকের দৃষ্টান্তে শিখিবে যে, আপনার জন্য নয় পরের জন্য যখন খেলা যায়, তখনই বেশী আমোদ; সে আরও শিখিবে যে, নিজের যশের জন্য নয়, বিদ্যালয়ের গৌরবের জন্য যে খেলিতে পারে, সেই ভাল খেলে। সে আরও শিখে যে, সেই ভাল খেলোয়াড় যে সংযত ভাবে খেলিতে পারে এবং প্রণালীসঙ্গত শক্তির প্রয়োগ করে। ভাল খেলোয়াড় হইবার উদ্দেশ্যে সে নিজের শরীরকে এমনই শিক্ষিত করে যে, শরীর তাহার ইচ্ছাধীন হয়। এইরূপে কর্ম্মসংযম তাহার অভ্যস্ত হয়; এবং আত্মসংযমের দ্বারা সে এই মহাশিক্ষা লাভ করে যে, আত্মসংযম হইতেই সুখের বৃদ্ধি হয় এবং কর্ম্মে সফলতা হয়।

ক্রীড়াক্ষেত্রে আর এক শিক্ষা লাভ হয়, সে শিক্ষা—ভাবসংযম। খেলিবার সময় যে বালক মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারে, সে ভাল খেলিতে পারে না। সেই জন্য সে ধীর ও সাবধান হইতে শিখে এবং হারের সময় বাক্যসংযম এবং জিতের সময় গর্ব্বসংযম শিক্ষা করে। এইরূপে তাহার সংযত ও শক্তিশালী চরিত্র গঠিত হয়। পরে যখন সে সংসারে প্রবেশ করে, তখন ঐ চরিত্র তাহার বিশেষ

কাজে আইসে। পাঠাগার অপেক্ষা ক্রীড়াক্ষেত্রেই এই সকল বিষয় অনেক ভালরূপ শিক্ষা করা যায়।

৩। মত-সহিষ্ণুতা। এ সম্বন্ধে আমার গুরুদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিবৃত্তিমার্গের সাধকের জন্য। কিন্তু তথাপি ঐ উপদেশের মর্ম্ম সংসারী জীবের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। বিদ্যালয়ে এই মত-সহিষ্ণুতা বিশেষ আবশ্যক। বিশেষতঃ যেখানে ছাত্রেরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। আমার গুরুদেব বলিয়াছেনঃ—"সকলের প্রতিই পূর্ণাঙ্গ মত-সহিষ্ণুতার ভাব পোষণ করিবে। তোমার নিজের ধর্ম্মমতগুলির প্রতি যেমন, অপর ধর্ম্মাবলম্বীর বিশ্বাস ও মতগুলির প্রতিও তদ্রূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা আবশ্যক। কারণ যেমন তোমার নিজের ধর্ম্ম সেই পরমপুরুষের নিকটে যাইবার একটী পথ, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মও ঠিক সেইখানে যাইবারই ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র। যদি সকলের উপকার করিতে চাও, তাহা হইলে, সকল মত ও বিশ্বাস তোমাকে বুঝিতে হইবে।" শিক্ষকের উচিত, তিনিই যেন এই পথের প্রথম পথপ্রদর্শক হন।

কিন্তু দেখা যায় যে অনেক শিক্ষকই এই ভ্রম করেন যে, যেন তাঁহাদের পরিচিত ও অভ্যস্ত মত ও নিয়মই সার্ব্বভৌম বিধি, যাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্য তাঁহারা ছাত্রদিগের বিশ্বাস ও প্রথা নষ্ট করিয়া, তাহার স্থলে আপন মত ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন। ভারতবর্ষের মত দেশে (যেখানে ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী) সেখানে এই ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায়। শিক্ষক যদি না ছাত্রদিগের ধর্ম্মমত অনুকূল ভাবে আলোচনা করেন এবং যদি না মনে রাখেন যে, তাঁহার ধর্ম্মমত যেমন তাঁহার প্রিয়, অপরের ধর্ম্মমতও সেইরূপ অপরের প্রিয়, তবে তিনি সম্ভবতঃ বালকদিগকে ধর্ম্মমাত্রের প্রতি বিশ্বাসহীন করিয়া তুলিবেন। ছাত্রেরা যে ধর্ম্মাবলম্বী, শিক্ষক মহাশয় যেন সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্ভ্রমের সহিত আলোচনা করেন ; যেন প্রত্যেক ছাত্র তাহার নিজধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব সকলে শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা সকল ধর্ম্মের একত্ব উপলব্ধি করে। দিবসের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যে উপাসনা করা হইবে, যদি তাহা সার্ব্বভৌমিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তদ্দারা এই

বিষয়ে অনেক সাহায্য হইবে। প্রত্যেক বালককে তাহার নিজ ধর্ম্মের বিশেষত্ব শিখাইতে হইবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার যেন তাহাকে সকল ধর্ম্মের মূল ঐক্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়; কারণ, (গুরুদেবের ভাষায়) "প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই পরমপুরুষের নিকট পঁহুছিবার পথ।"

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা কিরূপে নির্ব্বিরোধে এক সঙ্গে বাস করিতে পারে এবং পরস্পরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সম্মান দেখাইতে পারে, আমার মনে হয়, তাহা প্রদর্শন করা, জাতীয় জীবনে বিদ্যালয়ের একটী বিশেষ কার্য্য। বাড়ীতে বালকেরা সম-মতাবলম্বীদিগের সাহচর্য্য করে —যাহাদের ভিন্ন বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, এরূপ লোকের সহিত মিশিবার কোন সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়ে তাহাকে এই সুযোগ দেওয়া উচিত এবং শিক্ষকের উচিত তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, সকল বিশ্বাসই মূলতঃ এক। শিক্ষক যেন কোন বালকের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অথবা অজ্ঞতা বশতঃ সেই ধর্ম্মের বিকৃত রূপ দেখাইয়া, বালকের শ্রদ্ধার হানি না করেন। কারণ এরূপ করিলে, সে বালক সকল ধর্ম্মকেই অবজ্ঞা করিতে শিখিবে।

বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। লোকেরা অনেক সময় ইহাদের প্রতি অযথা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ইহাদিগকে ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করে। ঐ ঐ প্রথা যে প্রাদেশিক বিশেষত্ব, তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। সেই জন্য যাহাদের প্রথা ভিন্ন, এইরূপ লোকের প্রতি তাহারা ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে এবং আপনাদিগকে সগর্ব্বে স্বতন্ত্র রাখে। আমি জানি না, পাশ্চাত্য দেশে কতদূর এই অসুবিধা আছে। কিন্তু দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে দূরত্ব অথবা ধর্ম্মভেদের অপেক্ষা প্রথাভেদে মানুষকে স্বতন্ত্র রাখে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিচ্ছদ আহার শিখাবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। আমি দেখিয়াছি যে, বিদ্যালয়ে বালকেরা যে সকল সহপাঠীর আচার ব্যবহার বিভিন্ন, প্রথম প্রথম তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা-দৃষ্টি করে। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে এই সকল তুচ্ছ ভেদ অতিক্রম করিতে শিখাইবেন এবং বুঝাইবেন যে, তাহারা সকলেই এক জন্ম-ভূমির সন্তান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বালকদিগকে পরজাতি-বিদ্বেষ-

বিহীন স্বজাতিপ্রেম শিখাইতে হইবে। অপর জাতির সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন ও সদ্ভাব-পোষণ মত-সহিষ্ণুতার অঙ্গ। বালকদিগকে বাধ্য হইয়া স্বদেশের এবং পরদেশের ইতিহাস শিখিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণে পরিপূর্ণ। শিক্ষক মহাশয় যেন বুঝাইয়া দেন যে, ঐ সকল যুদ্ধবিগ্রহের ফলে, মানবকে কি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং যদিও যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও এবং কদাচ বা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মানবের উন্নতির স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তথাপি বিদ্বেষ অপেক্ষা শান্তি ও সদ্ভাব দ্বারা মানবের অধিক মঙ্গল। বিভিন্ন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা পোষণ না করিয়া, যদি বালকেরা তৎপ্রতি অবধান ও আত্মীয়ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা করে, তবে বড় হইলে, তাহারা সকল জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে।

---

(৪) **সন্তোষ।**—যে শিক্ষক ছাত্রদের যথার্থ স্নেহ করেন, তিনি বিদ্যালয়ে কখন তুষ্টচিত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সাহসী ব্যক্তি কখন নিজেকে অবসন্ন হইতে দেন না। শিক্ষকের পক্ষে এই অবসাদ বড় হানিজনক। কারণ তাঁহাকে নিত্য বহুছাত্রের সংস্পর্শে আসিতে হয় এবং তাঁহার চিত্তের ভাব তাহাদের মধ্যে সংক্রান্ত হয়। শিক্ষক যদি অবসাদগ্রস্ত থাকেন, তবে ছাত্রেরা অধিকক্ষণ হৃষ্ট ও প্রসন্ন থাকিতে পারে না এবং হৃষ্ট ও প্রসন্ন না থাকিলেও তাহাদের পাঠাভ্যাস ভাল হয় না। যদি শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই পাঠ্য জীবনের সহিত সন্তোষের যোগ করেন, তবে তাঁহাদের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে এবং তাঁহারা বিদ্যালয়কে জগতের দুঃখ মোচনের স্থান বিবেচনা করিবেন।

শিক্ষক এমন ভাবে নিজেকে শিক্ষিত করিবেন, যেন তিনি বিদ্যালয়ের চৌকাঠে পদার্পণ করিবামাত্র সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত অবসাদ মন হইতে অপসারিত করিতে পারেন—যেন ছাত্রদিগের চিত্তোৎকর্ষের স্থান বিদ্যালয়ের বাতাস সন্তোষ ও শক্তির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত থাকে। চিত্তের অবসন্ন ভাব দূর করিবার

প্রধান উপায় কোন কিছু উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ বিষয়ের ভাবনা করা। শিক্ষক যখন ছাত্রদিগের নিকটে যাইতেছেন, তখন এরূপ চিন্তা খুব সহজ। কোন চিন্তায় মনের আত্যন্তিক সংযোগ না করিলেই তাহার বিলয় হয়; সেইজন্য অবসাদের চিন্তার সহিত সংগ্রাম না করিয়া, তাহা হইতে মনোযোগ সরাইয়া লওয়া ভাল। সন্তোষ দ্বারা বাস্তবিকই জীবনের পুষ্টি হয়, অবসাদ জীবনকে ক্ষুণ্ণ করে। অতএব অবসাদের হাত এড়াইলে, শিক্ষকের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। যে শিক্ষক সংসারের ভারে পীড়িত, তাঁহার পক্ষে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নয়; তথাপি তিনি যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকেন, ততক্ষণ যাহাতে তাঁহার মনে দুশ্চিন্তার উদয় না হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।

মিষ্টার আরণ্ডেল আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি এমন অভ্যাস করিয়াছেন যে, কলেজে প্রবেশ করিবার পুর্ব্বে তিনি যতই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত থাকুন না কেন, যে মুহূর্ত্তে কলেজের দ্বারে উপস্থিত হন, অমনি সন্তোষ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করে। তিনি এ বিষয়ে লিখিয়াছেন:—"আমার চেষ্টা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে

সন্তোষ ও উৎসাহ আনয়ন করা। প্রত্যহ কলেজে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে সন্তোষের অভিনয় করিতে করিতে এখন আমার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, কলেজে প্রবেশ করিলেই আমি প্রফুল্ল হই। ঐ সময় কলেজের প্রাঙ্গণে কোন বালককে যদি বিষণ্ণ বা অবসন্ন দেখিতে পাই, তবে আমি স্বয়ং তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া, আমার প্রফুল্লতার দ্বারা তাহার বিষাদকে বিদূরিত করি। তাহার পরই দৈনিক উপাসনা আরব্ধ হয়। তখন ধর্ম্মশিক্ষকের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সেই সকল কিশোর ও বালক-দিগের উপর গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ আবাহন করি এবং প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিক্ষকমহাশয় ভাল না মন্দ মেজাজে আছেন, বালকেরা তাহা তাঁহার মুখের ভাবে লক্ষ্য করে। শিক্ষক যদি ঐ ঐ সময় প্রফুল্ল ও স্নেহময় থাকেন, তবে আর ছাত্রেরা তাঁহার ঐ ভাবে লক্ষ্য করিবে না; কারণ তাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে এবং তাহাদের ভয় ভাবনা দূরে যাইবে। শিক্ষক

মহাশয় যদি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে পারেন, তবে তিনি ছাত্রদিগের মধ্যে শক্তি ও সদ্ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে পারিবেন। তদ্দ্বারা তাহাদের মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চারিত হইবে, তাহাদের একাগ্রতা আসিবে এবং শিক্ষকের সহানুভূতিদ্বারা তাহাদের অনবধান বিজিত হইবে।

ক্রীড়া-ক্ষেত্রে বালকেরা যেমন কর্ম্মসংযম শিক্ষা করে, সেই সঙ্গে তাহারা এই সন্তোষেরও সাধনা করিতে পারে। পরাজয়ে যে প্রফুল্ল থাকে, তাহার চরিত্র-বল বৃদ্ধি পায়। যে বালক বিজেতা দলের প্রতি প্রফুল্ল ও অনুগ্র ভাব দেখাইতে পারে, যথার্থ পৌরুষ লাভ করিতে তাহার বেশী বিলম্ব নাই।

৫। একাগ্রতা।—একাগ্রতা অর্থে যখন যে কায করা হইবে, তৎপ্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া,যেন সে কায যথাসম্ভব সুসম্পন্ন হয়। এই একাগ্রতা প্রধানতঃ আগ্রহের উপর নির্ভর করে। শিক্ষাদান কার্য্যে যদি শিক্ষকের আগ্রহ না থাকে এবং তিনি সকল কার্য্য অপেক্ষা ঐ কার্য্যকে অধিকতর ভাল না বাসেন, তবে তিনি কখনই একাগ্র হইতে পারিবেন না। বিদ্যালয়ের কার্য্যে শিক্ষক মহাশয়ের

এমন বিভোর হওয়া উচিত, যেন তাঁহার মন সদাই ছাত্রদিগের উন্নতি কল্পে ব্যাপৃত থাকে। শিক্ষাদানই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য; প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত এই কার্য্যের কি সম্বন্ধ তাঁহার মন যেন সর্ব্বদা তাহারই অনুশীলন করে।

একাগ্রতা হইতে উৎসাহের জন্ম; কিন্তু আদর্শ ভিন্ন উৎসাহ অসম্ভব। অতএব যে শিক্ষক একাগ্র হইতে চান, তাঁহার সম্মুখে আদর্শ রাখিতে হইবে, যদভিমুখে তিনি বিদ্যালয়কে চালিত করিবেন। ঐ সকল আদর্শ তাঁহার মনোযোগকে তীক্ষ্ণ করিবে, যেন তিনি ক্ষুদ্র বিষয়েও অবহিত হইতে পারেন। আদর্শ বিদ্যালয়ের ছবি তাঁহার মানস-চক্ষে সততই ভাসিবে এবং তিনি তাঁহার বিদ্যালয়কে ঐ আদর্শের সমীপস্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। যদি একাগ্রতা লাভ করিতে চাহেন, তবে শিক্ষক মহাশয় বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবেন না। পরন্তু বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানের জন্য সতত সচেষ্ট রহিবেন।

ছাত্রদিগের শক্তির বিষয়ে এবং দেশের অভাবের বিষয়ে, শিক্ষকের অভিজ্ঞতা যত বাড়িবে, তাঁহার আদর্শও সঙ্গে সঙ্গে তত

পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপে কালসহকারে শিক্ষক হয়ত দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্বে যে সকল আদর্শ তাঁহাকে প্রণোদিত করিত, এখন তিনি তাহা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। এখনও আদর্শের দ্বারাই তিনি চালিত হইবেন ; তবে এখন তাঁহার আদর্শের সহিত আচরণের বেশী যোগ থাকিবে। অতএব তাঁহার একাগ্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা সুতীক্ষ্ণ হইবে এবং বেশী ফলপ্রসূ হইবে।

গুরুদেব একাগ্রতা সম্বন্ধে দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার মনে হয়, উহার দ্বারা একাগ্র কর্ম্মের লক্ষণ বেশ পরিস্ফুত হইয়াছে। "তোমার হস্ত যাহা কিছু করিবার পাইবে, যেন সমগ্র শক্তির সহিত তাহা করে।" "যাহাই করনা কেন, সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহা করিও। মানুষের জন্য করিতেছ এরূপ ভাবিয়া করিও না, পরমেশ্বরের কার্য্য করিতেছ এইরূপ ভাবিয়া করিও।" যে কাযই কর না কেন, তাহা সু-সম্পন্ন করিবে ; তবে তোমার কার্য্যের সঙ্গে ভগবানের অভিপ্রায়ের যেন সামঞ্জস্য থাকে এবং তাহা যেন ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত হয়। গুরুদেব বলিয়াছেন—"প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মভাবে করিতে হইবে—এই ভাবিয়া করিতে হইবে যে,

ভগবানের চরণে ইহা একটি পবিত্র উপহার। ‘হে ভগবন্ তোমার নামে এবং তোমার অর্থে ইহা করিতেছি’ এইরূপ ভাবিয়া যদি কর্ম্ম করি, তাহা হইলে, আমার যাহা শ্রেষ্ঠতম, তাহা অর্পণ না করিয়া কি থাকিতে পারিব? তাঁহার উদ্দেশ্যে যদি কর্ম্ম করি, তবে কি কোন কিছু অযত্নে বা অনবধানে করিতে পারিব? তুমি যদি জান যে, এখনি ভগবান্ আসিয়া তোমার কার্য্য দেখিবেন, তবে তুমি কি ভাবে কার্য্য কর? ঠিক জানিও ভগবান্ সমস্ত দেখিতেছেন, কারণ যাহা কিছু ঘটে, কিছুই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নয়; অতএব মানুষের জন্য নয়, ভগবানের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত কার্য্য কর্ম্ম কর।”

শিক্ষক সমস্ত কর্ম্মে জগতের বিবর্ত্তন-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন; কেবল ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী স্বার্থের লক্ষ্যে করিবেন না। বিবর্ত্তনে তাঁহার আপনার স্থান কোথায়, শিক্ষক ক্রমশঃ তাহা বুঝিয়া লইবেন, যেন তিনি আপনার সম্বন্ধে একাগ্র হইতে পারেন। শিক্ষক যদি না নিজের আদর্শ সম্বন্ধে একাগ্র হন, তবে তিনি অপরের উপর কিরূপে তাহার প্রয়োগ করিবেন? তিনি ছাত্র-

দিগকে যে আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চান, নিজে যেন সেই আদর্শের অনুরূপ হন। ঐ আদর্শের অনুরূপ হইবার চেষ্টাতে তিনি তাহার অনেক বিবরণ জানিতে পারিবেন, যাহা অন্যথা তাঁহার চক্ষেই পড়িত না, অথবা যাহা তিনি অপ্রয়োজন মনে করিয়া অবহেলা করিতেন।

অতএব একাগ্রতার ব্যবহারিক প্রয়োগ এইরূপ হইতেছে যে, মনের কেন্দ্রস্থলে একটী মহৎ আদর্শ রাখিতে হইবে এবং তাহার অভিমুখে শিক্ষক এবং ছাত্রের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে, যেন তাহাদের ক্ষুদ্র জীবন বৃহৎ জীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং সকলেই এক বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ—সেবার আদর্শ এমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা যাইতে পারে যে, সমস্ত দৈনন্দিন জীবন সেবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইবে।

৬। বিশ্বাস। আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষককে যে সকল সাধন-সম্পন্ন হইতে হইবে, তাহার মধ্যে প্রেম প্রধান। প্রেমের প্রায় সমান আর একটী সাধন আছে—সে সাধন বিশ্বাস। ইহার

আলোচনা করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সমাপ্ত করিব। আপন লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন—শিক্ষকের যদি এই ধ্রুব বিশ্বাস না থাকে, তবে তিনি ছাত্রদিগের মনে সে বিশ্বাস কিরূপে সঞ্চারিত করিবেন ? আমরা জানি মানুষের সমস্ত ক্ষেত্রে সফলতার অবশ্যম্ভাবী উপায়—আত্মপ্রত্যয়। কেন আমাদের আপনার উপর বিশ্বাস থাকা উচিত, গুরুদেব অতি সুন্দর ভাবে তাহা বুঝাইয়াছেন।—'নিজেকে বিশ্বাস করিবে। তুমি কি বল, যে তুমি নিজেকে বেশ ভাল করিয়া জান ? যদি এরূপ মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিজেকে জাননা—তাহা হইলে, তুমি কেবল বাহিরের আবরণটাকে জান, যাহা অনেকবারই কর্দ্দমে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তুমি ? প্রকৃত তুমি ? সে যে ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে তোমার মধ্যে রহিয়াছেন। এজন্য জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, ইচ্ছা করিলে তুমি যাহা না করিতে পার।' শিক্ষকের বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা দিতে সমর্থ এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে পারগ। ছাত্রদিগের প্রতি স্নেহ হইতে এই শক্তির উদ্ভব এবং সেই সর্ব্বপ্রাণ

পরমাত্মা এই শক্তির প্রস্রবণ। যে হেতু শিক্ষকে ও ছাত্রে সেই এক আত্মা বিদ্যমান, তাহারা উভয়েই সেই মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ, সেই জন্য শিক্ষকের এ বিশ্বাস সঙ্গত যে, ছাত্রের সাহায্য কল্পে তিনি যে কিছু চেষ্টার প্রয়োগ করিবেন, সেই চেষ্টা শিক্ষকে অবস্থিত সেই মহাপ্রাণের প্রেরণে বর্দ্ধিত হইয়া, ছাত্রে অবস্থিত খণ্ড মহাপ্রাণকে প্রেরণা করিবে।

শিক্ষক সকল সময়ে নিজের চেষ্টার ফল সদ্যঃ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ শিক্ষকের প্রভাব প্রধানতঃ ছাত্রদিগের চরিত্রোন্নতিতে প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার ফল ভাল হইল, কার্য্য-বিবরণীতে প্রশংসা রহিল, পরিদর্শক সুখ্যাতি করিলেন, যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি এ সকলে নিজের সফলতা বোধ করেন না। কিন্তু তিনি যখন মনে মনে অনুভব করেন যে, ছাত্রদিগকে সেবা করিবার আগ্রহে তাঁহার আত্মা পুষ্ট ও পবিত্র হইতেছে, তিনি যখন দেখেন যে, তাঁহার মধ্যে ভগবানের যে অংশ আছে তাহার প্ররোচনায় ছাত্রগণে অবস্থিত ভগবানের অংশ বিস্ফূর্জ্জিত হইতেছে, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। তখন তিনি পরম

শান্তি অনুভব করেন; কারণ, তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে ভগবত্তার ভাব জাগরিত করিয়াছেন, যে ভাবে ভাবিত হইয়া, তাহারা অচিরেই হউক অথবা বিলম্বেই হউক পূর্ণতা লাভ করিবে।

শিক্ষকের আপনাতে প্রত্যয় থাকা সঙ্গত। কারণ ভগবানের অংশ তাঁহাতেও আছে, ছাত্রদিগের মধ্যেও আছে এবং ছাত্রেরা উৎসাহের জন্য আর বলের জন্য তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব, তিনি ছাত্রদিগের অভিমুখে তাহা প্রেরণ করুন। নিশ্চয় জানিবেন যে, তাহা হইলে এমন কোন ছাত্র নাই, যে না আপনার শ্রেষ্ঠভাব লইয়া তাঁহার ভাবের প্রতি-ধ্বনি করিবে—তা' সে ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হউক বা না হউক।

অন্য পক্ষে ছাত্রদিগের শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ প্রত্যয় থাকা উচিত; তাঁহাকে ভাল বাসিতে এবং বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করা উচিত। শিক্ষক যখন নিজেকে ভালবাসার উপযুক্ত করিবেন, তখন ইহা হইবেই হইবে।

শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে সেই মহাপ্রাণের এইরূপ নিত্য বিনিময় হইতে তাহাদের মধ্যে আত্মীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা এক পরিবারস্থ বড় ভাই ও ছোট ভায়ের মত একসঙ্গে বাস করিতে শিখিবে। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ভ্রাতৃভাবের জীবন যাপন করিতে অভ্যাস করিয়া, তাহারা দেশের বৃহৎ পরিধির মধ্যে সেইভাব সঞ্চারিত করিবে। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত জগৎ ভ্রাতৃভাবের একটী মহামণ্ডল; সর্ব্বত্র এক মহাপ্রাণ বিরাজমান, এবং ভ্রাতৃমণ্ডল-ভুক্ত ব্যক্তিগণ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সেই মহাপ্রাণকে অভিব্যক্ত করিতেছে। যে শিক্ষক নিজের ভগবত্তা অনুভব করিয়াছেন, তিনিই সুখী। মানবের ভগবত্তা-শিক্ষা তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যের চরম শিক্ষা। ইহা হইতে উচ্চতর শিক্ষা তিনি আর কি দিতে পারেন?